নানাবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে করিতে তাহার মুণ্ড ভক্ষণ করিতে যমরাজকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সেই নিষ্ফল আক্রোশের অন্তরালে থাকিয়া বিনয়ভূষণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল।

রামধন মুখুয্যে বিনয়দের বাড়ীর পাশেই থাকেন। তেজারতি কারবারে তাঁহার বেশ দু'পয়সা আয় আছে। কিন্তু তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে মাত্রাটা কিছু অধিক চড়িয়া যাওয়ায় গ্রামে তাঁহার একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল যে, প্রভাতে কেহ তাঁহার শ্রীমুখখানি দর্শন করিয়া ফেলিলে তাহার আর সে দিন অন্ন জুটিত না। এই সুনামটিই মুখুয্যেকে চারিদিকে বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। এক এক দিন তাঁহার প্রতি বিনয়ের দৃষ্টি পড়িত।

প্রভাতে নিজের ঘরে বসিয়া বৃদ্ধ হয় তো এক মনে খাতাপত্র খুলিয়া হিসাব মিলাইতেছেন, বিনয় গিয়া অতি শান্ত-শিষ্ট-ভাবে প্রণাম করিয়া কাছে বসিল। মুখুয্যে খাতা হইতে চোখ তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—কিহে বাপু, কি মনে করে? কোনো দরকারে এসেছ বুঝি?

বিনয় বলিল,—না, বিশেষ কিছু নয়—এই দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল—তাই বলতে এসেছি।

মুখুয্যে কথাটা শুনিবার জন্য নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনয় তখন মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া যেন কতই কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—এই বলছিলাম কি—যদি আপনি এই ঘরের সামনের দরজাটায় একটা পর্দ্দা খাটিয়ে দেন—তা হ'লে আমাদের বড়ই উপকার হয়। নয়তো আমাদের বড় দুর্গতি হচ্ছে।

এ কথাটার অর্থ সহসা বুঝিতে না পারিয়া নিরীহ বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "পর্দ্দা খাটিয়ে দেবো! কেন পর্দ্দা খাটিয়ে দিয়ে কি হবে?" বিনয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তা' না হলে আমাদের তো বড়ই দুর্দ্দশা হয়—এই ঘরটার ঠিক সামনের ঘরেই রাত্রে আমরা শুই।" সকালে ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে দাঁড়ালেই আপনার দিকেই প্রথম নজর পড়ে; তাতে অর্দ্ধেক দিন খাওয়াই হয় না আমাদের! তাই বলছি, যদি এই দরজাটাতে একটা পর্দ্দা দিয়ে দেন তা হ'লে বড়ই উপকার হয়।

এতক্ষণে কথাটার মর্ম্ম বুঝিয়া মুখুয্যে সহসা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—হারামজাদা, বদমাস্, বাড়ী বয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসে জুটেছ! বাপবয়সী লোকের সঙ্গে ঠাট্টা! লেখাপড়া শিখে বেশ জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। যাচ্ছি এখনি তোর বাপের কাছে—মজা দেখাচ্ছি! হতভাগা!

বিনয় হাসিতে-হাসিতে বলিল,—আজ্ঞে আপনি খামাকা অত চট্‌ছেন কেন? আমাদের দুর্গতি-টাও তো একবার ভেবে দেখ্‌তে হয়!

মুখুয্যে বলিলেন,—বেরিয়ে যা বল্‌ছি আমাদের বাড়ী থেকে। নয়তো এই খড়মের চোটে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো! ফাজলামী করবার আর জায়গা পাস নি বটে! আমার হাতে পড়লে আমি তিন দিনে তোকে টাট্ করে ছেড়ে দিতাম।

মুখুয্যে যতই রাগিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, বিনয় বাহিরে আসিয়া ততই হাসিতে হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

এইরূপে তাহার বিনয়ের মাত্রাধিক্যে গ্রাম-বাসীদের সহিষ্ণুতা যখন ক্রমে চরম সীমায় উঠিয়াছে এবং কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ বা অন্তরে যখন তাহার সম্বন্ধে ভগবানের দরবারে নানারূপ মঙ্গল কামনা করিতেছে, তখন একদিন সকলে সবিস্ময়ে শুনিল যে, বিনয়ভূষণ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে।

কথাটা প্রথমে কেহ বিশ্বাস করিল না। সে

নিয়মিতরূপেই ইস্কুলে যাইত বটে, কিন্তু পড়া করিতে তাহাকে কেহ কখনো দেখে নাই। সাঁতার-কাটা, ঘুড়ি-উড়ানো, মারামারি, দাঙ্গা করিয়া যে সর্ব্বক্ষণ কাটাইয়াছে, সে আবার পাশ করিবে! কিন্তু কেহ বিশ্বাস না করিলেও কথাটা যে সত্য, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইল হাঁ বিনয় একটা ছেলে বটে। পড়িয়া তো অনেকেই পাশ করে, কিন্তু না-পড়িয়া কে এমন হয়? তাহার পিতামাতা এ সংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শীঘ্রই তাহার বিবাহ দিয়া ঘরে বধূ আনিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনয়ের ইচ্ছাটা যে তাঁহাদের ইচ্ছার ঠিক বিপরীত, তাহা সে প্রবলভাবে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিল। এবং কলেজে পড়িবার জন্ম শীঘ্রই সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

২

কলেজে যাহাদের সহিত বিনয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রমোদলালের কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রমোদের পিতা জগৎবাবু কোনো সওদাগরী আপিসের মুৎসুদ্দীর কাজ করিতেন। তিনি কতকটা আধুনিক তন্ত্রের লোক— হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও প্রচলিত রীতি-নীতিগুলি বড়-একটা মানিয়া চলিতেন না। তাঁহার কন্যা-দুটি ইস্কুলে লেখাপড়া করিত, এবং জেষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিলেও তিনি তাহার বিবাহ দেন নাই, এজন্য লোকে তাঁহার চালচলন-সম্বন্ধে নানা কথা রটাইত।

জগৎবাবুর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য প্রমোদ একদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। জগৎবাবু তখন বাহিরের ঘরে একখানা সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। প্রমোদ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'বাবা, আজ বিনয়কে ধরে এনেছি; তোমার মতের সঙ্গে ওর মতগুলো ভালরকম মিলে যায় বলে আমি তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।'

জগৎবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। এবং বিনয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তাহার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন,—বোসো বাবা, প্রমোদের মুখে তোমার কথা শুনে পর্য্যন্ত তোমাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে ছিল। কতদিন আগে থেকে তোমাকে ডেকে আনবার জন্ম আমি ওকে বলেছিলাম।

প্রমোদ বলিল,—তুমি বলবার আগে থেকেই আমি ওকে আনতে চেষ্টা করছি। ও বড্ড কুনো সহজে কি আসতে চায়? যখনি দেখা হয় তখনি দেখি একখানা বই হাতে করে বসে আছে!

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি কি সব সময়েই পড়াশুনা কর? বৈকালেও বেড়াতে বা খেলতে যাও না?

বিনয় বলিল,—না, বৈকালে একবার বেড়াতে যাই বটে, তবে খেলা বা বেড়ানোর চেয়ে পড়তেই আমার বেশী ভাল লাগে। বৈকালে প্রায়ই কোনো লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ে আসি।

ইহা শুনিয়া জগৎবাবু বলিলেন—তা হলে তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসেও পড়তে পার। আমারও পড়াটা বড় ভাল লাগে। যদিও আমার কাজ করে বেশী সময় পাই নে, তবু যেটুকু সময় থাকে আমি তাতেই পড়ার চর্চ্চা রাখি। বিশেষ এই সন্ধ্যার সময়টা তো আমি অন্য কোনো কাজে হাত দিই নে। আমার লাইব্রেরীতে খুব যে সংগ্রহ আছে তা নয়—তবে নিতান্ত কমও নেই। তুমি যখন-ইচ্ছে তখনি এখানে এসো।

কলিকাতায় আসিয়া বিনয়ের প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার বাল্যের চাঞ্চল্য ও দুষ্টবুদ্ধি দূর হইয়া দিন দিন তাহার জ্ঞান-পিপাসা

বাড়িতেছিল। কলেজের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখিতে সে কিছুতেই প্রস্তত ছিল না। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে, সমস্তই সে জানিতে চায়; তাই সে যখন যেখানে কোনো ভাল পুস্তক পাইত, কলেজের পড়া সারিয়া সময়মত তাহা পাঠ করিত। অবসরমত লাইব্রেরীতে গিয়া ইচ্ছামত পাঠে নিমগ্ন থাকিত। তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে গ্রন্থকীট বলিয়া কত বিদ্রূপ করিত, তথাপি তাহাতে তাহার কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না; কিন্তু তাহার স্বভাবের দুই একটি দোষ সে ছাড়িতে পারে নাই। তাহার কোনো মত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না। যে সময় সে খেয়াল মাথায় আসিত সে তখন সেইরূপ কাজ করিত। সময়-সময় অতি সামান্য কারণেই সে ভয়ানক রাগিয়া উঠিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা যাইত না। তাঁহাদের কথা চলিতেছে, এমন সময়ে লাবণ্য আসিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইল। বেহারা তাহার পশ্চাতে ট্রের উপর চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, লাবণ্য পিতার সম্মুখে চা রাখিতেই তিনি বলিলেন,—বিনয়বাবুকে চা দাও লাবণ্য, উনি তোমার দাদার বন্ধু।

লাবণ্য দুই পেয়ালা চা লইয়া বিনয় ও প্রমোদের সম্মুখে রাখিল। জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে বলিলেন,—'বিনয়, এইটি আমার বড় মেয়ে। সন্ধ্যার পর যখনি তুমি আসবে, দেখবে এই ঘরটিতে আমি আর লাবণ্য দুজনে পড়ছি আর গল্প করছি। প্রমোদ সব সময় বাড়ী থাকে না, ওর বন্ধু-বান্ধবদের কাছেই প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে আসে; আমিও তাতে বাধা দি নে; কিন্তু লাবণ্য না থাকলে আমার এক মুহূর্ত্তও চলে না! আর ওরও এমনি স্বভাব যে, আমার যা-কিছু কাজ সব নিজে না করলে ওর তৃপ্তি হয় না, আর সন্ধ্যার সময়টি এই বুড়ো বাবার সঙ্গ না পেলে ওর সময় কোনোমতেই কাটতে চায় না। ইহা বলিয়াই জগৎবাবু সহাস্যে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। লাবণ্যও সলজ্জভাবে মুখ নত করিল।

লাবণ্যর উপস্থিতিতে বিনয় একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। এরূপ বয়স্থা কিশোরীর সহিত আলাপে সে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু জগৎবাবুর এত পরিচয় করিয়া দেওয়ার পর দুই একটা কথা না বলা বড় অভদ্রতা হয়, সুতরাং সে বিশেষ চেষ্টার সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া লাবণ্যকে বলিল,—আপনিও বুঝি পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসেন?

লাবণ্য বলিল,—হাঁ, আমি বাবার সঙ্গে পড়তে ভালবাসি; খুব ছোটবেলা হ'তে বাবার কাছে থেকে ও পড়ে-পড়ে এখন এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, একদিন পড়া বন্ধ হলেই কষ্ট বোধ হয়।

ইহার পর বিনয় আর কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন,—এবার থেকে আমাদের একজন সঙ্গী বাড়বে লাবণ্য, বিনয়বাবু মাঝে মাঝে এখানে লাইব্রেরীতে পড়তে আসবেন। উনি যখন আসবেন, আমি যদি না থাকি, ওঁকে লাইব্রেরী-ঘর খুলে দিও।

লাবণ্য উৎসাহের সহিত বলিল,—তা' হ'লে তো খুব ভালই হবে বাবা, আমি আমার পড়ার যেখানটা বুঝতে না পারব, ওঁর কাছ থেকে বুঝে নিতে পারব।

দিন-দিন জগৎবাবুর পরিবারের সহিত বিনয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। সে প্রায় বৈকাল হইলেই প্রমোদের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী চলিয়া আসিত। প্রমোদ প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না। বিনয় জগৎবাবুর নিকটে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বই পড়িয়া ও গল্প করিয়া কাটাইয়া যাইত। লাবণ্যও প্রায় সে সময় উপস্থিত থাকিত। এইরূপ মেলা-মেশার ফলে বিনয়ের সব সঙ্কোচ ও

লজ্জা দূর হইয়া যাইতে লাগিল এবং উন্নতচরিত্র শান্তপ্রকৃতি জগৎবাবুর প্রতি তাহার অন্তর একান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল।

৩

জগৎবাবুর পত্নী লাবণ্যার বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাত্রের অনুসন্ধানে তিনি দুই তিনটি ঘট্‌কী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন যে-কোনো পাত্রের সন্ধান আনিত, জগৎবাবু কোনো-না-কোনো ছল ধরিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেন ; এ বিষয় লইয়া গৃহিণীর সহিত তাঁহার মাঝে মাঝে মনান্তর ঘটিত।

আজ দুপুরবেলা ঘট্‌কী একটি অতি শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ আনিয়াছিল। পাত্র কোনো জমীদারের ছেলে, দুই তিনটা পাশ করিয়াছে, ধন-সম্পত্তি মান-সম্ভ্রম অগাধ। কত বড় ঘর হইতে তাহার জন্য সম্বন্ধ আসিতেছে, ঘট্‌কী তো বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে যেন সে ফিরিয়া আসিবার আগে কোথাও কথা দেওয়া না হয়, কিন্তু এখন কর্ত্তা এসব শুনিয়া একটু শীঘ্র সেখানে কথা পাড়েন তবে তো হয়—না হইলে সে-সব ছেলে পড়িয়া থাকিবে না—কত ভাল ঘর হইতে সে পাত্র লুফিয়া লইবে!

গৃহিণী সব শুনিয়া সেখানেই কথা পাড়িবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। এবার কর্ত্তা আর কি ওজর করিবেন? ঘর বর সব ভাল, ছেলে বিদ্বান্, কোনো কথা বলিবার জো নাই, ইহাতেও যদি তাঁহার মন না উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

বৈকালে আপিস্ হইতে আসিয়া জগৎবাবু জলযোগ করিতে বসিলে গৃহিণী বলিলেন, 'আজ ঘট্‌কী লাবণ্যার জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছিল।'

—সত্যি নাকি! কোথাকার ছেলে?

গৃহিণী উৎসাহের সহিত ছেলের রূপ-গুণ ও বংশ-মর্য্যাদার কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ করিয়া উপসংহারে তিনি বলিলেন,—এমন সব-দিকে-ভাল ছেলে আর পাবে না। দেরি না করে এইখানেই কথা পেড়ে ফেল।

জগৎবাবু বলিলেন,—তুমি যে আসল কথাটাই ভুলে গেলে। কথা পাড়বার আগে তো দেখ্‌তে হবে যে তাদের খাঁই মেটাবার ক্ষমতা আমার আছে কি না? সে কথা ঘট্‌কী কিছু বল্‌লে না?

গৃহিণী বলিলেন,—তা বলেছে বই কি? সে এমন কিছু বেশী না ; হাজার দশেক হ'লেই হবে!

জগৎবাবু শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গৃহিণী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, -কি, কথা কও না যে? দশ হাজার টাকা কি তোমার পক্ষে এত বেশী হ'ল? এ টাকা না পেলে তারা রাজী হবে না। অত বড় ঘরে মেয়ে দেবে তার চেয়ে দশ হাজার টাকার ভাবনা তোমার বেশী হ'ল? যক্ষের ধন আগ্‌লে বসে থাক্‌বে না কি?

জগৎবাবু বলিলেন,—আমি যে কি ভাবছি, তা তুমি বুঝছ না। আমি দশ হাজার কেন, বিশ হাজার টাকা মেয়েকে যৌতুক দিতে পারি, কিন্তু সে আমার নিজের ইচ্ছায়। আমার মেয়েকে আমার যা সাধ্য হবে আমি স্বেচ্ছায় দেবো, কিন্তু কেউ যে পণে বদ্ধ করে আমার টাকার পরিমাণে মেয়ে ঘরে নেবে, সেটা আমি সহ্য করতে পারি নে।

গৃহিণী এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন ; এবং বলিলেন,—এমন কথাও কখনো শুনি নি! চিরকাল ধরে যে নিয়ম চলে আসছে, তোমার মেয়ের বেলায় তা রদ হবে? কেন তাদেরই বা এত গরজ কিসের যে একটা দেনা-পাওনার কথা না বলে অমনি তোমার মেয়ে নেবে? আর কি তাদের মেয়ে জুটবে না?

জগৎবাবু বলিলেন,—জুটবে না তা কি বল্‌তে পারি? যদি তারা ওর চেয়েও বেশী টাকার দাবী কর্‌ত, তা হলেও কত মেয়ের বাপ মাথায় করে

মেয়ে আর টাকা তুলে দিয়ে আন্‌ত। এই যে আজকাল আমাদের সমাজে ছেলেমেয়ের বিয়ে একটা জঘন্য ব্যবসায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এর জন্য মেয়ের বাপেরাই প্রধানতঃ দায়ী। কেন তারা বরপক্ষের সব অসঙ্গত দাবী মাথা পেতে নিতে যায়?

গৃহিণী বলিলেন,—কি করবে না নিয়ে? মেয়ে নিয়ে চিরকাল বসে থাকতে তো পারে না? আর তা-ছাড়া যা চিরকালের নিয়ম, তা না মান্‌লে চলবে কেন?

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন,—ঐখানেই তোমার বিষম ভুল। চিরকাল এ নিয়ম কখনো ছিল না, এসব এখনই কিছুদিন আগে থেকে হয়েচে। আর যদি বহুকাল থেকে একটা কুপ্রথা সমাজে চলেই এসে থাকে, মানুষে তার প্রতীকার করবে না? নিয়ম হয় আর কি করে? মানুষেই করেছে তো? মানুষেই যা সৃষ্টি করেছে, মানুষের দ্বারাই আবার তা ভাঙ্‌বে।

গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন,—আমি তোমার অত সাত-সতর শুন্‌তে চাই নি; মেয়ের বিয়ে দেবে কি না, তাই বল। ষোলো বছরের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে বসে' রইল, তার বিয়ের কথা বলতে গেলেই যত অনাসৃষ্টি বক্তৃতা জুড়ে দেবেন! ভাল জ্বালাতেই আমি পড়েছি। যা হোক, তা হ'লে ওখানে বিয়ে দিতে তোমার মন নেই?

জগৎবাবু বলিলেন,—তুমি রাগ কোরো না—ও সম্বন্ধটা সত্যিই আমার মনে ধরছে না!

'আমি আর এ সংসারের কোনো কথায় থাক্‌বো না! যার যা-ইচ্ছে সে তাই করুক। আমি কোথাকার কে যে আমার কথা থাকবে'? বলিয়া গৃহিণী রাগে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া জগৎবাবু স্ত্রীকে বলিলেন,—তুমি যে মেয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ—আমিই কি মনে কর নিশ্চিন্ত আছি? আমি কি লাবণ্যর বিয়ের কথা ভাবছি নে? তুমি মিছে আমার সঙ্গে রাগারাগি করছ।

গৃহিণী অভিমানভরে বলিলেন,—আমার কি দরকার কোনো কথা বলে? আমি তো আর কিছু বলব না!

জগৎবাবু বলিলেন,—দেখছি, আমি যে বর ঠিক করে রেখেছি, তা তুমি শুন্‌তে চাও না; যাক্ তা হলে আমি আর কি করব?

বর ঠিক হইয়াছে শুনিয়া গৃহিণী উৎসুক চিত্তে বলিলেন,—কোথায় বর ঠিক করেছ?

তখন জগৎবাবু বলিলেন,—আমাদের বিনয়কে তোমার কি মনে হয়? ছেলেটি দেখতে শুন্‌তে লেখাপড়ায় কেমন সুন্দর বল দেখি?

বিনয় প্রমোদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসিত এবং গৃহিণীকে মা বলিয়া ডাকিত। গৃহিণীও তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, দুই এক দিন তাহাকে না দেখিলে ব্যস্ত হইতেন, নিজে বসিয়া তাহাকে না খাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু এ সব প্রমোদের বন্ধু হিসাবে:—সে যে কোনো দিন বাড়ীর জামাতা হইতে পারে একথা কখনো তাঁহার মনে আসে নাই। তাঁহার মনে সর্ব্বদা অতুল ঐশ্বর্য্যময় ধন জন-পূর্ণ জমীদার-বাড়ীর কুটুম্বিতার সুখময় চিত্র জাগরূক ছিল; স্বামীর কথা শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—বিনয় ছেলে ভাল বটে, তবে নিঃস্ব।

জগৎবাবু বলিলেন,—সে কথা ছেড়ে দাও। তার যদি যোগ্যতা থাকে তা হ'লে পয়সার জন্য ভাবতে হবে না। প্রতিভাবান্ উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী স্বয়ং এসে বরণ করেন। নিজের কথা ভেবে দেখ না—যখন তোমার বিয়ে হয়েছিল তখন কি আমার এমনি অবস্থা ছিল? আমি বিশেষ করে দেখেছি—তার অসাধারণ প্রতিভা, যে দিকেই সে যাবে সে-দিকে কখনো হেরে আসবে না। এই

তো এক সঙ্গে এফ্-এ দিলে, কিন্তু প্রমোদের চেয়ে কত ভাল পাশ হল, দেখ্‌লে তো?

গৃহিণী বলিলেন,—এ কথা কি তাকে বলেছ?

জগৎবাবু বলিলেন,—না এখনো কারুর কাছে বলি নি। সে বি-এ পাশ হোক্ তার পর বল্‌ব। আরো ভেবে দেখ, লাবণ্যর বয়স হয়েছে, সে লেখা-পড়া শিখেছে, আর যে-ভাবে সে এতদিন মানুষ হয়েছে এখন যদি তোমার কথামত স্থানে তার বিয়ে হয়, তা হলে তার পক্ষে সেটা বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। তুমি তার জন্য কিছু ব্যস্ত হইও না, সময় হলেই আমি তার এমন ব্যবস্থা করব, যাতে সে কখনো কষ্ট না পায়।

এফ্-এ পাশ হইবার পরেই বিনয়ের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। সে বাড়ী গেলে তাঁহার বিধবা মাতা তাহাকে বিশেষভাবে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ একলা বাড়ীতে আর তাহার মন টিকে না। বিনয় এখন বাড়ী আসুক, তাহার বিবাহ দিয়া ঘরকন্না হইলে তবু যা-হোক তাঁহার মনটা একটু সুস্থ হয়। আর চিরকালই কি বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইবে? বিনয় অবশ্য এ-সব কথায় কর্ণপাত করে নাই, তবে এখন তাহাকে কতকটা আর্থিক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তাহার কলেজের ও বাসাখরচের ব্যয় তাহাকে অবসরমত ছেলে পড়াইয়া উপার্জ্জন করিতে হইত, কিন্তু তাহার অসহিষ্ণু চিত্ত এ ব্যবস্থায় দিন-দিন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। নিজে একটু সময় পায় না— সব সময়টা কেবল পড়া কর আর পড়াও। জগৎবাবুর বাড়ীতেও আর আগের মত যাইবার অবকাশ তাহার থাকিত না।

সেদিন বিনয় পাশের খবর জানিতে পারিল, সেই শুভ সংবাদ দিবার জন্য সেই দিন সন্ধ্যার পর সে জগৎবাবুদের বাড়ীতে গেল। প্রমোদ তখন ঘরে ছিল না। জগৎবাবু ও লাবণ্য বসিয়া তাহাদেরই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। প্রমোদ ও বিনয়ের সফলতার সংবাদে জগৎবাবু অতিশয় সুখী, লাবণ্যও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। বিনয় ঘরে ঢুকিতেই লাবণ্য হর্ষোজ্জ্বলমুখে বলিল,—'আসুন বিনয়বাবু, আমরা এতক্ষণ আপনাদের পাশের কথাই বল্‌ছিলাম। দাদার চেয়ে এবারও আপনারই নম্বর বেশী হয়েছে।'

বিনয় হাসিয়া বলিল,—মনে করেছিলাম আমিই খবরটা প্রথমে দেবো, কিন্তু আপনারা দেখছি আমার আগেই জেনে নিয়েছেন।

জগৎবাবু বলিলেন,—প্রমোদ একটু আগে আমাদের খবর দিয়ে গেল। যা'হোক আমি বড় সুখী হলুম, বিনয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে প্রমোদ হ'তে ভিন্ন ভাবি নে; দিন-দিন তোমার উন্নতি হোক, তুমি সুখী হও, আমারা তাই কামনা করি।

তার পর লাবণ্যকে বলিলেন,—মা বেহারাটা কি কর্‌ছে দেখ তো, এখনো চা নিয়ে এল না—সন্ধ্যা হয়ে গেছে?

লাবণ্য চলিয়া গেলে জগৎবাবু বলিলেন,—তা হলে এখন কি করবে মনে করেছ বিনয়?

বিনয় এখন কোন্ দিকে যাইবে এবং কি করিবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। সে একটু ভাবিয়া বলিল,—কি কর্‌ব তাই তো ভাবছি। আপনি কি পরামর্শ দেন?

জগৎবাবু বলিলেন,—আমি তোমার বিষয় যা ভেবে রেখেছি, তা বল্‌ছি শুন। এখন তোমার অবস্থা যে-রকম অস্বচ্ছল আমি তা জানি, আমার ইচ্ছে যে লাবণ্যকে তোমার হাতে দিই; তুমি উপস্থিত আমার কাছেই থাক, আর যতদূর তোমার পড়তে হয়, যে লাইনে যেতে ইচ্ছে কর—সব ভার আমিই বহন করব। তার পর যখন তুমি উপযুক্ত হবে, স্বতন্ত্রভাবে থাকার মত সামর্থ্য হবে, তখন তাকে নিয়ে যাবে। তুমি তো এই তিন চার বৎসর তাকে দেখছ, যদি এ বিষয়ে তোমার কোনো

আপত্তি না থাকে, তা' হ'লে আমি তা'কেও জিজ্ঞাসা করে দেখব। এখন তুমি নিজে ভেবে দেখ।

বিনয় এ প্রস্তাব শুনিয়া সহসা কিছু বলিতে পারিল না। সে এ বিষয় কখনও মনে ভাবে নাই ; এখানে অনেকদিন আসিতেছে বটে, কিন্তু লাবণ্যকে প্রণয়-চক্ষে সে কখনও দেখে—নাই এ সব কথা তাহার মনে উদয়ও হইত না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন,—এখনি তোমার মত চাচ্ছি নে, তুমি আজ এ-কথা ভাল রকম বিবেচনা করে দেখ, কাল সকালে আমার কাছে একবার এসো।

আরো দুই চারিটি কথার পর জগৎবাবুর নিকট বিদায় লইয়া বিনয় যখন চলিয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে নীচের বারান্দায় দেখিয়া লাবণ্য বলিল,—"আপনি এখনি চলে যাচ্ছেন যে ? আমি আপনাদের চা নিয়ে উপরে যাচ্ছিলাম।"

এতদিন লাবণ্যকে বিশেষভাবে দেখিবারও অবসর বিনয়ের হয় নাই ; আজ জগৎবাবুর প্রস্তাবের পর সে সহসা বিশেষ মনোযোগের সহিত লাবণ্যর মুখের দিকে চাহিল। শান্ত-মধুর-সন্ধ্যায় লাবণ্যর প্রসন্ন-ও সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনয় মনে ভাবিল—সুন্দর বটে !

লাবণ্য কখন বিনয়কে লজ্জা করিত না, অসঙ্কোচে তাহার কাছে আসিয়া গল্প করিত, কিন্তু আজ যখন বিনয় তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তখন তাহার চক্ষে নূতন ভাবের আবেশ দেখিয়া অকস্মাৎ লাবণ্য লজ্জায় ও সঙ্কোচে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল! সে আর না দাঁড়াইয়া আস্তে-আস্তে পাশ কাটাইয়া "যাই, বাবাকে চা দিয়ে আসি" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিনয় তখন তাহার নিকটস্থ হইয়া মৃদুস্বরে—"আজ আমার একটু দরকার আছে, তা'ই আমি এখনি যাচ্ছি ; কাল সকালে আবার আসবো" বলিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া নানা মীমাংসার পর বিনয় মনে-মনে স্থির করিল, জগৎবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই এখন তাহার পক্ষে সর্ব্ব-বিষয়ে কল্যাণকর। প্রথমতঃ, সে যতদূর পড়িতে চায় ততদূর স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিবে, সে জন্য কোনো অসুবিধায় পড়িতে হইবে না ; এখন যে-সব অভাবের জন্য সে কষ্ট পাইতেছে সে-সব দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, লাবণ্যর মত শিক্ষিতা ও সুন্দরী স্ত্রী বিনা চেষ্টায় যে লাভ হইতেছে, এই সুযোগ অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

৪

বিনয়ের সহিত লাবণ্যর বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রমোদ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পড়িতেছে, বিনয় এম্-এ ও আইন পড়িতেছে।

এক দিন বৈকালে জানালায় বসিয়া লাবণ্য সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যের রশ্মি ক্ষীণ পড়িয়া তখন তাহাদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। উদ্যানের যে অংশে ভৃত্যদিগের থাকিবার গৃহ, সেইদিক হইতে একটা মিশ্র কলরব উঠিয়া সহসা তাহাকে চকিত করিয়া তুলিল! আজ শ্রীপঞ্চমী—পশ্চিমে এই দিনকে 'বসন্তপঞ্চমী' নামে অভিহিত করা হয়, এবং এই দিন হইতে ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত সেখানে অবিরাম উৎসব আনন্দেও গানে-গানে প্রতিগৃহ ও রাজপথ মুখরিত হইতে থাকে। জগৎ-বাবুর বাড়ীর দরোয়ান, মালী ও পশ্চিমে ভৃত্যেরা প্রবাসে থাকিয়াও এই সুখময়ী তিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিরত হয় নাই। তাহাদের বিচিত্র বাদ্য ও সকলের মিলিত কণ্ঠের বসন্ত আহ্বান-সঙ্গীতের উৎকট সুর শান্ত-মধুর—সন্ধ্যা'র নিস্তব্ধতার মধ্যে চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল।

বাগানের মালী রামটহল অতি নিরীহ-প্রকৃতির লোক, সে প্রায়ই বেশী কথাবার্ত্তা কয় না; কাজের সময় নীরবে নিজের কাজ করে, আর অন্য সময় চুপ করিয়া থাকে। আজ এই উৎসবের আনন্দে এবং তাড়ির মহিমায় হঠাৎ তাহার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তির লহরী খেলিতে লাগিল। এই আনন্দের আবেগে ও উত্তেজনায় সে আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পুলকে আত্মহারা হইয়া সে সহসা দল ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং হাত নাড়িয়া বিচিত্র-ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিল,—আজু বসন্তে মালা লে সখি!

তাহার সঙ্গীরা গম্ভীর-প্রকৃতি বৃদ্ধের এই কাণ্ড দেখিয়া অতিশয় আমোদ বোধ করিল, এবং আরো জোরে জোরে বাজনা বাজাইয়া যতই তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল, রামটহল ততই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। পথের লোকে বাগানের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

রামটহলের যুবক-পুত্র জেদী সে দলে ছিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া সহসা তাহার পিতার এই-রূপ রসাধিক্যে বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, রামটহল ততই তাহার হাত ছিনাইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া আপনি নাচিতে লাগিল। জেদী পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর পরাস্ত হইয়া যখন রাগে ও অপমানে ফুলিতেছে তখন পথ হইতে একজন ডাকিয়া বলিল,—"বুডঢাকা পাকড়কে ঘরকা ভিতর ফেঁকো, নেহি তো মাতোয়ালা অভি গির যায়ে গা।" জেদী তখন নিস্ফল আক্রোশে মুখ ঘুরাইয়া সরোষে বলিল,—আরে যানে দেও—ভেইয়া।

উপরের জানালায় বসিয়া লাবণ্য মালীর নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। বিনয় তখন অপ্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকিল। চাদর ও ছাতাটা একধারে ফেলিয়া সে বিরক্তভাবে খাটের উপর বসিয়া বলিল,—এখানে স্বাধীনভাবে একটা কাজ করবার যো নেই! রাত দিন বকাবকি করতে করতে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল।

তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া ভয়ে লাবণ্যর মুখ শুকাইয়া গেল। সে উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—কেন, কার সঙ্গে বকাবকি হল?

বিনয় বলিল,—"তোমার বাবার সঙ্গে, আবার কার সঙ্গে আমার বকাবকি হয়?" পিতার সম্বন্ধে বিনয়কে এরূপ উদ্ধতভাবে কথা বলিতে দেখিয়া লাবণ্য মনে বেদনা পাইল। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বিনয় আপন-মনে বলিতে লাগিল,—আমার পড়াশুনার বিষয়ে আমি যা ভাল বুঝবো তাই করব, অন্য লোকের এ-সম্বন্ধে কথা বলাই অন্যায়। এম্ এ পড়ায় যা-কিছু জানবার আছে আমি তো সে সবই জেনে নিয়েছি; আবার তাতে আরো ৬ মাস পড়ে থাকবার কি দরকার? ওঁর তা হবে না! এখন আরো ছয় মাস সেই গ্রহভোগ কর, একজামিন দাও, তা' না হলেই লম্বা লম্বা স্পীচ্ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে!

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া লাবণ্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল,—'বাবা কি মন্দ কথা বলেছেন? তোমারি তো দেখছি যে একটা কোনো বিষয়ে মতের স্থিরতা নেই। দাদা শিবপুর কলেজে গেল, তুমিও তার সঙ্গে সেখানে ঢুকলে; এক বছর না যেতে-যেতেই ফিরে এসে বল্লে, "আমি ওখানে আর যাব না। এম-এ আর আইন পড়বো।" বাবা তখনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন,—'যেটা করবে একবারেই সেটা স্থির করে নেওয়া উচিত।' আবার দেড় বছর পড়ে যেমন একজামিন দেবার সময় হল, এখন বলছ—আর পড়বে না। এ সব কি রকম খামখেয়ালী

কাণ্ড ! এই তো দাদা যেখানে গিয়েছে, সেইখানেই মন স্থির করে প’ড়্‌ছে !

বিনয় বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"আমি তো আর তোমার দাদার মত নুই—আমি যা ছয় মাসে জানব, তোমার দাদার তাতে দুই বচ্ছর যাবে। আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে চাই নি, যেটা সব জেনে নিয়েছি তা’তেই আবার মাথা ঘামিয়ে পড়ে থাকবো সে আমার কর্ম্ম নয়। এক্‌জামিন দিয়ে আর কি হবে, ঢের এক্‌জামিন দেওয়া গেছে। আর নাম কিনতে ভাল লাগে না। আর যত বার এক্‌জামিন দিয়েছি, কি রকম ফল হয়েচে, তা তো নিজেরাই দেখেছ! তোমার দাদা কোনো বার আমার সঙ্গে সমান হতে পেরেছে যে তার সঙ্গে আমার তুলনা করতে এস ?" লাবণ্যও রাগিয়া বলিল,—তোমার মত বিদ্বে আমার দাদার হয়ে কাজ নেই। যার মতি ঠিক নেই, তার আবার বিদ্বে কি ? রাত-দিন নিজের গর্ব্বে নিজেই অস্থির! আমার বাবার মত, কি দাদার মত যদি তোমার বিবেচনা-বুদ্ধি থাক্‌তো তা’হলে আর আমার এত ভাবনা থাক্‌তো না !

বিনয় উদ্ধতভাবে বলিল,—থাম থাম ঢের হয়েছে! বাবার আর দাদার গুণই তুমি খুব দেখতে পাও, আর আমি তোমার কাছে একটা চাকর-নফরের সমান। লেখা-পড়া শিখে কেবল কতকগুলো বচন ঝাড়ীতে শিখেছ বই তো নয় ? এমন অবাধ্য স্ত্রীর মুখ আমি দেখতে চাই নে।

রাগে অধীর হইয়া বিনয় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এবং ল’বণ্য বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

এইরূপ ঘটনা তাহাদের মধ্যে প্রায়ই হইত। বিবাহের পর যখন প্রথম প্রণয়ের আবেগে লাবণ্য নিজের অগাধ প্রেমে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হৃদয়-খানি একান্ত নির্ভরে স্বামীর প্রেমে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন বিনয়ের নিকট হইতে তাহার কোনো প্রতিদান পায় নাই। বিনয় স্বভাবতই তাহার প্রতি উদাসীন, যদিও কখনো তাহার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস আসিত, তাহা জোয়ারের জলের মত নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। বাড়ীতে সে যতক্ষণ থাকিত, প্রায় বই লইয়াই তাহার সে সময়টুকু কাটিয়া যাইত ; স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিবার অবসর থাকিত না। লাবণ্য তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের নিষ্ফল প্রেমের বেদনায় আপনাতে আপনি দগ্ধ হইতেছিল। তাহাও সহ্য হয়। কিন্তু যখন অতি সামান্য মাত্র ত্রুটীতে বিষম ক্রোধে বিনয় তাহাকে তীব্র তিরস্কার ও অপমান করিত, তখন দারুণ অভিমানে ও যাতনায় লাবণ্যর উচ্ছ্বসিত অশ্রু আর কিছুতেই বাধা মানিত না।

মানুষমাত্রেই ভ্রান্তির দাস, জগৎবাবুও ভুল করিয়াছিলেন। বিনয় সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, অসা-ধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ, তিনি তাহাই দেখিয়া-ছিলেন; কিন্তু সে যে অতি উগ্রপ্রকৃতি, অস্থিরচিত্ত, তাহা লক্ষ্য করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। যেমন দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভে একবিন্দু গোমূত্র পড়িয়া সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি তাহার সমস্ত সদ্‌গুণ প্রচণ্ড ক্রোধের আধিক্যে ঢাকিয়া গিয়াছিল। দিন দিন তাহার প্রকৃতির পরিচয়-পাইয়া ও আদরিণী কন্যার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জগৎবাবু অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলেন। ইহার উপর আবার গৃহিণী সময়-সময় কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিতেন,—"কোথা থেকে একটা গোঁয়ারকে ধরে এনে আমার এমন সোনার মেয়েকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিলে! এত জায়গা থেকে এত ভাল ভাল সম্বন্ধ এল, তার একটাও পছন্দ হল না ; অমানুষের হাতে পড়ে মেয়ে আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! তার মুখে হাসি নেই, মনে সুখ নেই, এমন বিয়েও হয়েছিল!"

এইসব নানা কারণে লাবণ্যর বিবাহের পর হইতে পরিবারে কাহারও মনে সুখ ছিল

না। লাবণ্য আপনার দুঃখভার নীরবে সহ্য করিত, পিতা-মাতাকে যথাসাধ্য জানিতে না দিয়া বাহ্যিক প্রফুল্লতার আবরণে সব কষ্ট চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। বিনয় যখন তাহাকে কোনো দুর্ব্বাক্য বলিত, তাহা সে নিঃশব্দে সহ্য করিত, কিন্তু সে যখন মাত্রাটা আরো একটু চড়াইয়া তাহার দেবতুল্য পিতার প্রতিও লক্ষ্য করিত, তখন লাবণ্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না, এবং সে একটি কথা বলিলেই বিষম কাণ্ড বাধিয়া যাইত।

জগৎবাবু ও লাবণ্যর একান্ত পীড়াপীড়িতে বিনয় এম্‌-এ ও আইনের পরীক্ষা দিল,—ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল। জগৎবাবু সহর্ষে বলিলেন,—বিনয়, এইবার তুমি হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ কর। আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ওকালতীতে পশার জমাইবার মত সাজ-সরঞ্জাম, গাড়ী-ঘোড়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সব প্রস্তুত হইল, জগৎবাবু তাঁহার বড় বড় উকীল ও ব্যারিষ্টার বন্ধুর সহিত জামাতার পরিচয় করাইয়া দিলেন, কিন্তু বিনয় এ সব ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ-মাত্র না করিয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কোনো দিন কোর্টে যায়, কোনো দিন যায় না, কখনো বা গিয়াই বেড়াইয়া চলিয়া আসে; লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলে,—ও সব আমার ভাল লাগে না। বকাবকি, তর্কযুদ্ধ দিনভোর মাথা ফাটাফাটি, কে ও-সব হাঙ্গামে যায়? আমি একটা প্রফেসারী চাকরী খুঁজে নেবো।

ফলে সে কিছুই করিল না। কখনো ভাবিল বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে, কখনো ভাবিল, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, কখনো কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। এই সব গুরুতর চিন্তার ফলে তাহার হাইকোর্টে যাইবার সময় হইত না।

দেখিয়া শুনিয়া শান্তচিত্ত জগৎবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অনেক সময় বিনয়ের অনুচিত কার্য্য দেখিয়াও তিনি শুধু লাবণ্যর মুখ চাহিয়া নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতেন। কিন্তু এরূপে তো আর চলে না। তাঁহাদের এত বয়সেও একদিন বসিয়া থাকিতে দারুণ কষ্ট বোধ হয়, এমনি কর্ম্মঠ প্রকৃতি। আর তাঁহার জামাতা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া কি নিরুদ্বেগচিত্তে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া দিনগুলা কাটাইতেছে!

এইরূপে যখন তাঁহার সমুদয় চিত্ত বিরক্তি ও ক্রোধে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তখন একদিন বিনয় আসিয়া বলিল,—আমার হাজার দুই টাকা চাই। জগৎবাবু বলিলেন,—তোমার টাকার এমন কি দরকার পড়ল? বিনয় প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল,—আমি কতকগুলো ভাল বই কিনবো। আমার নিজের একটা লাইব্রেরী করবার ইচ্ছে আছে। জগৎবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—বিনয়, টাকা যে অমনি আসে না, টাকা রোজগার করতে যে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়, এটা বোঝবার উপযুক্ত বয়স তোমার হয়েছে। এরকম অযথা ব্যয় করতে গেলে আমি কোথা থেকে পেরে উঠ্‌বো বল?

বিনয় উদ্গত-ক্রোধ কষ্টে সংযম করিয়া বলিল—অযথা ব্যয় আমি আর কি কর্‌ছি? একটা লাইব্রেরী ঘরে রাখা কি এত অন্যায় কাজ? জগৎবাবুও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—লাইব্রেরী রাখা অন্যায়-তা' আমি বলছি নে। তুমি জান বোধ হয় যে আমার নিজেরও লাইব্রেরী রয়েছে। তবে কথা এই যে, যখন তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই সে সুবিধা ভোগ করতে পাচ্ছ, তখন তার জন্ত আবার কতকগুলো টাকা জলে দেওয়া কেন? লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হয়েছ, এখন নিজে কিসে উপার্জন করতে পারবে সেই চেষ্টা দেখ। যখন নিজের বাড়ীতে-

বাসে তখন সেখানে লাইব্রেরী রাখতে সাধ হয়, স্বচ্ছন্দে রাখতে পার, এখন এখানে ওসবের কোনো আবশ্যকতা নেই।

রাগে বিনয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আপনি আজকাল আমাকে বড় শক্ত শক্ত কথা বলেন। এখানে আনবার সময় আমাকে কি বলে এনেছিলেন, তা বোধ হয় এখন আর আপনার মনে নেই!

জগৎবাবু বলিলেন,—মনে আমার বেশ ভাল রকমই আছে। আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে যেদিকে যেতে চাও সেইদিকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে দেবো, এই কথা বলেছিলাম। আমি আমার কথা মত কাজ করেছি, কিন্তু তুমি কি করে বেড়াচ্ছ? ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ভার নেবার ক্ষমতা আমার আছে, আমি যে সেজন্য কাতর হয়েছি তা মনে হয় না; কিন্তু আমি সে-ভার নিলেও তোমার কি আমাকে আর সে অবসর দেওয়া উচিত? যার বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব আছে, সে কখনো অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না।

বিনয় বলিল,—যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আজ যা বল্লেন তারপরে এক মুহূর্ত্তও আর এখানে আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকবো না। আমি আজই আমার স্ত্রীকে নিয়ে বিদায় হয়ে যাচ্ছি।

জগৎবাবু স্বভাবতই ধীরপ্রকৃতি, কিন্তু তিনি কখনো অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। বিনয়ের প্রতি নানা কারণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, আজ তাহার এই অসঙ্গত উদ্ধত ব্যবহারে তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে কোথায়? সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত করেছ কি? আগে তাকে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হও তখন তাকে নিতে এসো। আমি আমার মেয়েকে পাড়াগাঁয়ের এঁদো পুকুরে জল তুলতে আর বাসন মাজতে পাঠাতে পারবো না।

কর্ত্তার সঙ্গে জামাইবাবুর বচসা বাধিয়াছে, ভৃত্যের মুখে লাবণ্য এ সংবাদ পাইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। আজ না-জানি কি কাণ্ডই হবে।

সহসা জ্বলন্ত উল্কার মত বিনয় আসিয়া ঘরে ঢুকিল। লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া সে উগ্রকণ্ঠে বলিল,—এ বাড়ীতে আমি আর এক মিনিটও থাকবো না। তুমি বল—আমার সঙ্গে যাবে? না, এখানেই থাকবে? তাহার তখনকার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া লাবণ্য ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার গলা বুক শুকাইয়া গিয়াছে, সে কথা কহিতে পারিল না।

রাগে তখন বিনয়ের জ্ঞান ছিল না। সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া লাবণ্যর হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া বলিল—শুনতে পাচ্ছ না? আমার আর এক তিল দাঁড়াবার সময় নেই! যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও তো এখনি যেমন আছ নেবে এস! বল—আমাকে চাও, না তোমার বাবাকে চাও?

লাবণ্য তাহার অশ্রুসজল করুণ মিনতিপূর্ণ নেত্রে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—অত রাগ করেছ কেন? একটু শান্ত হয়ে আমার দুটো কথা শোনো, রাগের মাথায় কোনো কাজ করতে আছে?

বিনয় চীৎকার করিয়া বলিল,—আমি কোনো কথা শুনবো না, শুনতে চাই নে। শুধু আমার কথার জবাব চাই। বল, আমায় চাও না তোমার বাবাকে চাও?

লাবণ্য কাঁদিয়া বলিল,—আমি তোমাকেই চাই, যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব। তবে এমন করে বাবাকে রাগিয়ে, তাঁর অমতে কি করে যাই বল? তোমার পায়ে পড়ি একটু শান্ত হও।

বিনয় বলিল,—বেশ, তোমার যেতে হবে না, —বাবার কাছে থাক। তবে এইটে জেনে রেখ, আমার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই!

আমি জানবো আমার স্ত্রী নেই, তুমিও জেনো, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে! ঝড়ের মত উদ্দাম গতিতে বিনয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

৫

মে মাসের প্রভাত। তরুণ অরুণের কনক-রশ্মিসম্পাতে লণ্ডন-নগরী ঝলমল করিতেছে। পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত একটি সুরম্য অট্টালিকার ভোজন-কক্ষে মিঃ টেলার সপরিবারে প্রাতরাশে বসিয়াছেন। তাঁহার পরিজনবর্গ ব্যতীত একটি বঙ্গীয় যুবকও তাঁহার ভোজন-টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট। সে আমাদের বিনয়ভূষণ।

জগৎবাবু ও লাবণ্যর সহিত মনান্তর ঘটায় যখন সে তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার অনতিকাল পরেই সে লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার লণ্ডন-প্রবাসী কোনো বন্ধুর সাহায্যে সে এই ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে। এখানে থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবে ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা।

মিঃ টেলারের পরিবারে তাঁহার পত্নী ও কন্যা ক্লারা ব্যতীত উপস্থিত আর কেহ ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র হেন্‌রী নৌবিভাগে কার্য্য লইয়া দূর সমুদ্রবক্ষে চলিয়া গিয়াছিল। পুত্র-বিরহকাতর স্নেহাতুর বৃদ্ধ দম্পতির সন্তানবৎ সস্নেহ-ব্যবহারে ও প্রফুল্লবদনা চঞ্চলা সুন্দরী ক্লারার সঙ্গ-লাভে এই প্রবাসেও বিনয়ের কোনো কষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তবু আজি তাহার বিষণ্ণ মুখ তাহার অন্তরস্থ চিন্তা ও বেদনার বিষয় নীরবে জ্ঞাপন করিতেছিল।

প্রাতরাশ সমাপ্ত হইলে মিঃ টেলার কয়েকখানি পত্র লিখিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীও কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

বিনয় আজ ভালরূপে কোনো কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেছে না দেখিয়া ক্লারা বলিল,—মিঃ চৌধুরী, আজ কি আপনার শরীর ভাল নেই? আপনাকে এত মলিন দেখাচ্ছে কেন?

বিনয় চেষ্টাকৃত হাসির সহিত বলিল,—শরীর ভালই আছে, মিস টেলার, তবে কি না, মনটা আমার একটু চিন্তাগ্রস্ত, সেই জন্যই বোধ হয়··

ক্লারা বাধা দিয়া বলিল,—আপনি হয় তো ভারতবর্ষের কোনো সংবাদ পান নাই। স্বদেশের আত্মীয়-বন্ধুগণের কুশল সংবাদ না পেলে মন তো খারাপ হবেই।

ধন্যবাদ, আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন মিস টেলার।

মিষ্টার চৌধুরী, আমি আপনাদের দেশের গল্প শুনতে বড় ভালবাসি। আমরা পুস্তকে পড়েছি ভারতবর্ষ নাকি সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতির আবাসস্থল। যদি একথা সত্যি হয়, তা' হলে লোকে সেখানে কিরূপে বাস করে?

বিনয় বলিল,—একথা যথার্থ নয়। ভারতবর্ষ হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল হলেও মানুষের তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তারা লোকালয়ে আসে না। এবং কচিৎ এলেও মানুষের হাতে বিনষ্ট হয়।

মিষ্টার চৌধুরী, আমি আপনাদের দেশের বিষয়ে আরো অনেক তথ্য শুনেছি। ভারতবর্ষ দেখতে আমার এক এক সময় বড় ইচ্ছে হয়। দেশে আপনার আর কে কে আছেন?

বিনয় সহসা ক্লারার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। দেশের কথা উঠিলেই তাহার মানস-পটে ধীরে ধীরে একখানি সুন্দর মুখের প্রতিকৃতি জাগিয়া উঠে! কিন্তু সে তাহার কে! যাহাকে এ জীবনের মত ত্যাগ করিয়া সকল সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কথা আর কেন মনে আসে? এখন হইতে তাহাকে বাদ দিয়া নূতন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; সুতরাং লোকের কাছে সে পরিচয়ে আর কি ফল!

বিনয়কে কুণ্ঠিত ও নীরব দেখিয়া ক্লারা বলিল,—মিঃ চৌধুরী, আমায় মাপ করবেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় নি। আজ আপনার মন ভাল নেই, আপনাকে অধিকক্ষণ বিরক্ত করব না। ক্লারা চলিয়া গেল।

যেদিন লাবণ্যকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করিয়া বিনয় চলিয়া আসিয়াছিল, সেই দিনের স্মৃতি এখন তাহার পক্ষে বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম সে নিজে নিজে মনকে প্রবোধ দিত যে, ইহাতে তাহার কোনো দোষ নাই, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে নাই, লাবণ্যই তাহাকে অবহেলা করিয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত সেই অবাধ্য স্ত্রীর চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। উদ্ধতপ্রকৃতি গর্ব্বিত যুবক নিজের দম্ভ বজায় রাখিতে কিছুতেই লাবণ্যর বিষয় মনে আনিতে চাহিত না। স্ত্রীলোকের এত দর্প! এত তেজ! স্বামীর আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া, স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া যে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিল, তাহার বিষয় সেই-বা কেন ভাবিতে যাইবে? যদি তাহাকে ছাড়িয়া লাবণ্যর দিন যায়, তবে তাহারই বা কি ক্ষতি হইবে? সে তাহাকে গ্রাহ্য করে না!

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! তাহার যুক্তি তর্ক দম্ভ সব ভাসিয়া যায়! ভূমধ্য-সাগরের সীমাহীন নীল জল-রাশির মধ্যে ভাসিয়া যাইতে যাইতে সেই মুখ তাহার মনে পড়িত! সমস্ত দিনের কর্ম্ম-কোলাহল ও গোলমালের পর সন্ধ্যায় যখন জাহাজ নিস্তব্ধ হইত, গভীর সমুদ্র বক্ষে অসংখ্য তারকা-খচিত নীল আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বায়ুভরে বীচি-মালার সহিত নৃত্য করিত, সেই শান্ত স্তব্ধ চন্দ্রালোকে বিনয়ের মনে কাহার দুটি কোমল-স্নিগ্ধ নয়নের কাতর দৃষ্টি ভাসিয়া উঠিত! সে মানস-নেত্রে—দূরে বহুদূরে কোন নিরানন্দ গৃহের নির্জ্জন গবাক্ষে নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীর প্রতিচ্ছবি দেখিত, এবং তাহার সকল দম্ভ ও তেজ মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া তাহার আকুল চিত্ত সেই বাতায়নবর্ত্তিনীর নিকট ছুটিয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত! অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস! সে যাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রাণ যে কেবল তাহাকেই চায়!

লণ্ডনে আসিয়া এখানকার নূতন দৃশ্যে নূতন বন্ধুদের সঙ্গে ও অবিরল কর্ম্মপরায়ণ জনপ্রবাহের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া বিনয় নিজের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিল। এখনো সে সম্পূর্ণরূপে আপনার দম্ভ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে নিজে জগৎবাবুর নিকট কোনো সংবাদ দিল না; এবং কলিকাতার যে বন্ধু-বান্ধবকে পত্র দিত, তাহাদের বিশেষভাবে এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল।

কিন্তু তবু সে চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। নিজের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া সে নিজেই যথেষ্ট বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছিল। যাহার জন্য তাহার এ আকুলতা—যখন সে, তাহার নিকট ছিল, তখন তো একদিনের জন্যও এ-প্রেমের অস্তিত্ব বোধ করে নাই। আজ এই সুদূর সমুদ্র-পারে আসিয়া বিরহ-বেদনায় তাহার অন্তরস্থ সুপ্ত প্রেম এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে!

বিনয় অপরাহ্নে নদী-তীরে একাকী বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহাদের পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই পরীক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু তাহার পর? তাহার পরেই তো তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। দেশে গিয়া সে কি করিবে? সে কি আবার জগৎবাবুর নিকট গিয়া তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে? এ চিন্তা মনে আসিবামাত্র তাহার সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জগৎবাবু তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, এ-কথা সে কিরূপে

ভুলিয়া আবার তাঁহার কন্যাকে ভিক্ষা চাহিতে সেখানে যাইবে ? তাহার সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে লাগিল! এ দুরূহ সমস্যার কোনো মীমাংসা করিতে না পারিয়া সে সবেগে পদচারণা করিতে লাগিল।

রজনীর গাঢ় তিমির-ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া জগৎ আচ্ছাদিত করিল, এবং সান্ধ্য-ভ্রমণ-কারী নরনারীদলের প্রস্থানে জনবিরল নদীতট গভীর নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া গেল। সেই নীরব শান্তিময় সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে বিনয়ের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত হইয়া আসিল! বিদায়-কালীন লাবণ্যর সেই অশ্রুভরা কাতর মুখখানি মনে হওয়ায় তাহার সমস্ত চিত্ত কি-এক মোহে ও করুণায় আবিষ্ট হইয়া রহিল! সে মোহাবিষ্ট হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল,—লাবণ্য! লাবণ্য! আমার লাবণ্য! বহুদিনের পর এই চিরপরিচিত প্রিয় নামটির মধুরতায় ও প্রেমের আবেগে তাহার সর্ব্বশরীর পুলকে কণ্টকিত হইয়া নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল!

৬

বিনয় চলিয়া যাইবার পর দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লাবণ্য তাহার নিজের ঘরে জানালায় বসিয়া আপনার অতীত জীবনের কাহিনীগুলি স্মরণ করিতেছিল। বিবাহের পূর্ব্বের সেই সরল আনন্দময় জীবন! কি করিলে আবার সেই দিন-গুলি ফিরাইয়া পাওয়া যায়! এই যে তাহার বর্ত্তমানের উদ্দেশ্যহীন আশাহীন নিস্ফল জীবন—এ-ভার সে আর কতদিন বহন করিবে ? ইহ-জীবনে আর কি তাহার কোনো সুখের আশা আছে ? দিন, মাস, বৎসর গণিয়া কতদিন কাটিয়া গেল—একটা সংবাদও পাওয়া গেল না। তিনি কি তবে সত্যই তাহাকে একবারে ভুলিয়া গেলেন!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লাবণ্য ভাবিল লোকে বলে, অন্তরের সহিত অন্তরের যোগ থাকে, এক জনের জন্য যদি অন্য একজন যথার্থই একান্ত আকুল হয়, তবে সে কখনো দূরে থাকিতে পারে না; কিন্তু সে-কথা মিথ্যা; তাহার এই অনন্যনিষ্ঠ একাগ্র প্রেমের আকুল আহ্বান তো কই তাহার বাঞ্ছিতকে তাহার নিকটে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না! যে তাহাকে নিতান্ত নির্ম্মমের মত ফেলিয়া গিয়াছে, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এক দিনের জন্যও তো সে তাহাকে ভুলিতে পারে নাই! সে যে তাহার স্বামী, তাহার সংসারের অবলম্বন, তাহার জীবনসর্ব্বস্ব!

বলাই-চাকর আসিয়া বলিল,—জামাইবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! তাহাকে উপরে আনিতে বলিয়া লাবণ্য ছোট ভগ্নীপতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপরাধীর মত সঙ্কুচিতচিত্ত বিনয় ধীর-পদ-বিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লাবণ্য থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল! বিনয় তাহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—লাবণ্য, তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি; এ বারের মত আমায় মাপ কর, আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে লাবণ্য বক্ষের ভিতর এই দেড় বৎসরের পুঞ্জীকৃত রুদ্ধ বেদনা অশ্রুরূপে ফাটিয়া পড়িল! বিনয়ের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। প্রেম বিশ্বজয়ী—প্রেমের মোহন তুলিকা-স্পর্শে পাষাণেও জল ঝরিয়াছে!

পাশের ঘরে লাবণ্যর ছোট বোন লীলা তখন গাহিতেছিল—

কাছে ছিলে, দূরে গেলে দূর হতে এস, কাছে,
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

আমাদের কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী।

যেদিন হইতে সরলা বিধবা হইয়া বাড়ী আসিয়াছে, সেইদিন হইতে কি মনঃকষ্টে জীবন যাপন করিতেছি, তাহা যাহার কখনও আপনার জনের এমন হইয়াছে, তিনি ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না। শুধু কি তাহাই? যদি কোনও প্রাণের সামগ্রীকে জন্মের মত হারাইতাম, যদি সরলা আজ মরিত, তাহা হইলে কালের অলক্ষ্য-হস্ত-সঞ্চালনে সে শোকের জ্বালা ক্রমে প্রশমিত হইয়া আসিত—বুঝিবা কালে বিস্মৃতির শীতল সাগরে ডুবিয়া জন্মের মত জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু ইহাত তাহা নহে। এ রাবণের চিতা যে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে—চিরদিনের তরে আমার মানস-শ্মশানের বুকের উপর দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে! আর সরলার ঐ ভুবনমোহিনী রূপরাশি, ঐ বিজলী-বিনিন্দিত যৌবনোচ্ছ্বাস, সেই চিতানলে অহরহঃ ইন্ধন নিক্ষেপ করিবে! আমি কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া তা'র দিকে চাহিব? কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব? মানুষের প্রাণে কত সয়!

কত সয়—কে বলিবে! এই ব্রহ্মাণ্ডে সুখের যেমন অন্ত নাই, দুঃখেরও বুঝি অন্ত নাই। সৃষ্টি যে সাপেক্ষিক;—অনন্ত সুখের ভিত্তি অনন্ত দুঃখের উপর ভিন্ন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে? অনন্ত আশার অনন্ত কুসুমোদ্যান, অনন্ত প্রেমের অনন্ত লহরী, অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি, অনন্ত নৈরাশ্যের—অনন্ত বিরহের—অনন্ত বিভীষিকার চিত্র-ফলকে অঙ্কিত না হইলে ফুটিবে কেন? অনন্ত নীতি, অনন্ত সামঞ্জস্য, অনন্ত জ্ঞান,—অনন্ত প্রহেলিকা ভিন্ন কিসের ভিতর দিয়া বিকশিত হইবে? অনন্ত আকর্ষণ অনন্ত বিকর্ষণ ভিন্ন কেমন করিয়া আপনার শক্তির পরিচয় দিবে? অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত বিকাশ চলিয়াছে, তার মাঝখানে আমরা কে? আমরা কতটুকু? আমাদের মুখের দিকে কে চাহিবে? অনন্ত কোটী গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে এই বিশাল সূর্য্যমণ্ডল দিগন্তবিস্তারী সাহারা-মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাও নহে, তা'র মাঝে এই বসুন্ধরা কতটুকু? তা'র মাঝে আমরা কতটুকু—আমাদের জীবন কতটুকু—আমাদের সুখ দুঃখ কতটুকু? আমাদের মুখের দিকে কে ফিরিয়া চাহিবে! অনন্তের কাছে আমরাও বুঝি নগণ্য, আমাদের সুখ-দুঃখও নগণ্য!

কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র দুঃখটুকু আমাদের কাছে ক্ষুদ্র কেমন করিয়া বলিব? গোষ্পদে কতটুকু জল ধরে? দীন-দুঃখীর দুর্ব্বল পর্ণ-কুটীরে কতটুকু ঝঞ্ঝা সহিতে পারে? পিপীলিকার ক্ষুদ্র প্রাণে কতটুকু যন্ত্রণা সহ্য হয়? তাই বিচলিত হই, অন্ধকার দেখি, কাঁদিয়া আকুল হই। কান্না শুনিবার কেহ আছ কি? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ক্ষুদ্রের কাছে ক্ষুদ্র সাজিয়া দেখা দাও নাথ, একবার এই ক্ষুদ্র নয়ন-চকোরের সম্মুখে ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াও দেখি,—একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার কাছে কাঁদিব। এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র দুঃখের কথা তোমায় শুনিতেই হইবে—নহিলে কে শুনিবে? চক্ষু মুছাইতে হয় মুছাইও, ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু এই অনন্ত প্রেমসাগরে মিশাইতে হয় মিশাইয়ো—না হয় না মিশাইয়ো, তাহাতে

দুঃখ নাই। কিন্তু কান্না তোমায় শুনিতেই হইবে —নহিলে কাহার কাছে যাইব? কেহ তো নাই!

তোমরা বলিবে, "সরোজিনী, তো'র কিসের দুঃখ?" বটেই তো! যদি সরোজিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে, সরোজিনীর মত ভাই-বোন পাইতে, তাহাদের দুঃখ বুঝিবার হৃদয় পাইতে, তবে আপনিই বুঝিতে—বুঝাইতে হইত না। এসংসারে কয়জনের দুঃখ কয়জন বুঝে? কয়জনের জন্য কয়জন কাঁদে? কয়জনের প্রাণে কয়জন প্রাণ মিশায়? আবার কয়জনই বা কয়জনের কি করিতে পারে? এই তোমার ক্রোড়ে তোমার সোনার যাদু, তোমার অঞ্চলের নিধি, তোমার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তুমি নির্নিমেষনেত্রে তাহার ম্লান-ক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া নীরবে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছ; তোমার প্রাণ দিয়াও তুমি তাহার যন্ত্রণার একবিন্দু লাঘব করিতে প্রস্তুত আছ— কিন্তু তাহা পার কি? ঐ যে তাহার প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল, রাখিতে পারিলে কি? কোটী কোটী জীবের প্রাণ বলি দিয়াও ঐ প্রাণ-পক্ষীটি আর পিঞ্জরে ধরিয়া রাখিতে পার কি? তাই বলিতেছিলাম, কেই-বা কা'র কি করিতে পারে?—হায়, যেটুকু পারি তাও কি আমরা করি? কিন্তু সরলার এখন আমি কি করিতে পারি?

সরলার জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না সত্য, কিন্তু আপনি পুড়িতে পারি। তাহার কুসুম-সুকুমার হৃদয়-মাঝে যে দারুণ, তীব্র হুতাশন মাঝে-মাঝে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তাহার তপ্ত-লোল-জিহ্বা যে আমারও হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিবে! আর তাহার সেই অহরহঃ প্রজ্বলিত মরমের বহ্নিরাশির আঁচে আমিও যে অহরহঃ ঝলসিতে থাকিব। যে বহ্নির আঁচের এত জ্বালা, সে বহ্নির ইন্ধনের জ্বালা কত!— যাহার সামান্য অংশও জ্যেষ্ঠার এত অসহ্য, তাহার পূর্ণ বিক্রম কনিষ্ঠা কেমনে সহিবে? সহমরণ কেন উঠিল? সে-জ্বালা কত ক্ষণের? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহাপুরুষ ছিলেন, দুঃখ বুঝিতেন, তাই হিন্দুবিধবার চিরজন্মের জ্বালা একদিনে শেষ করিয়া দিতেন,—চিতার জ্বালা কতক্ষণের? জ্বলন্ত চিতানলে কুসুম-কোমল নারীদেহ পুড়িতে কতক্ষণ লাগে? কেবল জ্বালার কথায় তোমরা কেহ বিরক্ত হইতেছ!—আমাদের জীবন-কাহিনী শুনিও না; যাহার হৃদয় নাই সেই সুখী—তুমি সুখী—যাও আপনার সুখের কাছে ফিরিয়া যাও— তুমিও বাঁচ, আমরাও বাঁচি।

২

তোমরা কেহ কখনো রূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছ? যে রূপের লালসায় জগৎসংসার পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, সেই রূপ দেখিয়া কখনও শিহরিয়া উঠিয়াছ? যে রূপের মন্ত্রে সৃষ্টি চলিতেছে, যে রূপের অভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কিছুই বুঝি সম্ভব হইত না, যে রূপই বুঝি সৃষ্টির চরম লক্ষ্য, চরম উদ্দেশ্য, চরম পরিণতি, সেই রূপের সম্মুখে পড়িয়া কখনো গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে কি? অনেক ভাবুক বলিয়া ফেলিবেন, "অবশ্য"। কেহ বলিবেন—"ভয় পাইয়াছি বৈকি! নয়ন-রঞ্জনী, বনবিহারিণী, কালভুজঙ্গীকে সহসা পথিপার্শ্বে বক্ষ উন্নত করিয়া, গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, মস্তক উত্তোলন করিতে দেখিলে—ভয় পাইয়াছি বৈ কি।" কেহ বলিবেন—"চঞ্চলা চপলা, উন্মত্তা উতলা বিদ্যুল্লতা আমার মাথার উপর তাহার ভুবন-ভুলানো হাসির ঝলক্ তুলিলে, আসন্ন অশনি-সম্পাত-ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছি বৈকি!" আবার কেহ-বা বলিবেন—"প্রভঞ্জনের পথে, অকূল-সমুদ্র-বক্ষে, নিদাঘের সায়াহ্ন-ঝটিকা-সন্তাড়িত অম্বরচুম্বি-উত্তাল-ফেনিল-নীল-তরঙ্গরাজী-

সংস্কৃত লবণাম্বুরাশির উদ্বেল উচ্ছৃঙ্খল রূপরাশি দেখিয়া দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে বৈকি !"

কিন্তু আরো বাকি আছে,—তাহা তমোগুণ-প্রধান কলিকালের হিন্দুর বাল-বিধবার রূপ। কখনো দেখিয়াছ কি ? কোন্ চক্ষে দেখিয়াছ ? লালসার চক্ষে ? তোমার জন্ম পৃথক নরক প্রস্তুত হইতেছে। যদি আর কোনো চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা হয়, আর যদি তুমি যুবক অথবা প্রৌঢ় হও, তবে দুখানি চরণের দিকে চাহিয়া থাকিও, চক্ষু উপরে তুলিও না। তুমি ক্ষুদ্র মানব, বল কতটুকু ? বাক্যালাপ করিবার পূর্ব্বে মাতৃ-সম্বোধন করিও —আপনার গর্ভধারিণীকে স্মরণ করিও। সাবধান! যদি অক্ষম হও, তবে এ পবিত্র হিন্দুসমাজ হইতে দূর হও, পবিত্র হিন্দুর সংসারের ত্রিসীমা-পর্য্যন্ত যেন তোমার ছায়া পতিত না হয়। পবিত্র আর্য্যবংশে তোমার জন্ম, একথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না !

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, আমি বলি,—সরলা আমার সহোদরা, সরলা বাল-বিধবা, সরলা অনিন্দ্য-সুন্দরী, সরলা এখন ষোড়শী। সরলার ভরা যৌবন ভাদ্রমাসের ভরা নদী টল্ টল্ ছল্ ছল্—ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, দুকূল ভাসাইয়া বহিয়া চলিয়াছে ! কি সর্ব্বনাশ ! কি হৃদয়বিদারক মধুর ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! সরলা বিধবা, কিন্তু প্রকৃতি তাহা শুনিবে কেন ? তোমার ছেলে মরিয়াছে বলিয়া আকাশে চাঁদ উঠিবে না কেন ? তোমার হৃদয়-রঞ্জনীর বস্ত্রাবৃত শবদেহ ঐ প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া, "বউ কথা কও" কেন চুপ করিয়া থাকিবে ? তোমার সাধের যৌবনে ভাঁটা পড়িয়া আসিল বলিয়া, বনের ফুল বন হাসাইয়া আবার কেন ফুটিয়া উঠিবে না ? আর সরলার অকাল-বৈধব্য ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার রূপের নদীতে যৌবনের বন্যা কেন আসিবে না ? কলিকাল, সমাজ পিশাচ-সঙ্কুল, লোকালয় বিলাস-বাসনার লীলাভূমি, সরলা মানবী, এ সঙ্কটে ক্ষুদ্র বালিকার মুখের দিকে কে চাহিবে প্রভো !

ত্বমাদি-দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। তুমিই তাহাকে রক্ষা করিয়ো, তুমিই তাহার হৃদয়ে বল দিয়ো, তুমিই তাহাকে পুণ্যধামে আশ্রয় দিয়ো—আমরা কে নাথ !

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কখনো রূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছ ? সরলাকে আজ-কাল বড় দেখিতে ইচ্ছা করে না। সেদিন একখানি তসরের কাপড় পরিয়া আমার এখানে আসিয়াছিল,—তার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম ;—সেই শ্বেত-চন্দন মাখানো ডব্‌-ডবে বকফুলটির দিকে চাহিয়া সত্যই বড় ভয় হইয়াছিল ! যাহাকে এত ভাল-বাসি, যে মোমের পুতুলটিকে চিরকাল বুকের ভিতর করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিত, একদিন আসিয়া আমার বাড়ী দুরন্তপনা না করিলে চারি-দিক অন্ধকার দেখিতাম, আজ তাহাকে দেখিলে ভয় করে, তার দিকে চাহিতে ইচ্ছা করে না !

সেই টগর ফুলের মত ডব্‌-ডবে মুখখানি, সেই শেফালিকার বোঁটার মত রাঙা-রাঙা ঠোঁট দুটি, সেই ডালিমের দানার মত মাড়ির গায়ে সারি-সারি সাজানো কুন্দ ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলি, সেই আমাদের বংশের গৌরব, বংশের বিশেষত্ব, বংশের সাধারণ-সম্পত্তি তাহার অতুলনীয় চক্ষু-দুটি, সেই আল্‌তার মত টুক্-টুকে ছোট্ট-ছোট্ট হাত গুলি ;—আর তাহার উপর সেই মাথা-ভরা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলের রাশি, সেই আঁটালো সাঁটালো, ধাপালো-ধোপালো বাড়ন্ত-সাড়োল গড়ন, সেই ঢল্-ঢল্ চল্ চল্ টল্-টল্ অঙ্গসঞ্চালন, সেই মৃগরাজ বিনিন্দিত-ক্ষীণ-কটি, গজরাজ-বিনি-ন্দিত-মন্দ-গতি—দেখিলে কিনা গা শিহরিয়া উঠে ! যাহা দেখিলে কোথায় আনন্দে বুক ভরিয়া যাইবে, তাই দেখিয়া কি না আজ বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠে !

তাহার অপরাধ ?—সে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে। যাকে হাতে গড়িয়া কত শিখাইলাম, কত পড়াইলাম, আজ মনে হয় সব ভস্মে ঘি ঢালিয়াছি। সে যে হিন্দুর মেয়ে! ওগো! তোমরা কোন্ সাহসে তোমাদের আদরের মেয়েটিকে লেখা-পড়া শিখাইতেছ? কোন্ ভরসায় তাহাকে যত্ন করিয়া এত কাজ-কর্ম্ম শিল্প-কারু শিখাইতেছ? তোমাদের মেয়েটির রূপের মাধুর্য্য, গুণের গরিমা, বিদ্যার গৌরব দেখিয়া কোন্ কারণে আহ্লাদে আট্‌খানা হইতেছ? কোন্ প্রাণে তোমাদের মেয়েকে সার্কাস্ দেখাইয়া, চিড়িয়াখানা দেখাইয়া, খবরের কাগজ পড়াইয়া, গল্প করিয়া, দেশ দেখাইয়া, মানুষ দেখাইয়া, ছবি দেখাইয়া, ম্যাপ্ দেখাইয়া বহুদর্শিতা শিক্ষা দিতেছ? কোন্ প্রাণে তাহাকে ভাল খাওয়াইয়া, ভাল পরাইয়া, ভাল রাখিয়া, সুখের আস্বাদ দেখাইতেছ? কোন্ হিসাবে তাহাকে তাড়াতাড়ি সন্তানপালন শিক্ষা দিয়া রাখিতেছ, 'মা' হইতে শিক্ষা দিয়া রাখিতেছ, গৃহিণী হইতে শিক্ষা দিয়া রাখিতেছ? কোন্ জ্ঞানে তাহাকে হাসিতে দাও, আহ্লাদ করিতে দাও, আব্‌দার করিতে দাও? ভয় করে না? মনে থাকে না—সে হিন্দুর মেয়ে? মনে থাকে না—হিন্দুর মেয়ের সুখ-সৌভাগ্য পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায়—এই-আছে-এই-নাই?

তোমরা বলিয়া উঠিবে, "বিধবা হইলে কি এ সকল গুণ কাজে লাগে না?" লাগে বৈকি! ঘরে বাল-বিধবা নাত্‌নী, কিন্তু নিজের ষাট বছর বয়সেও বিবাহের সাধ মিটে না;—তোমাদের মধ্যে বাস করিয়া বিধবার এই সকল গুণ যেমন কাজে লাগে, এমন আর কোথায় লাগিবে? রাত্রি না পোহাইতে চা-হালুয়া না পাইলে ঘুরিয়া পড়, এর মাঝখানে তেরো বছরের বালিকার বৈশাখ মাসের নির্জ্জলা একাদশী বেশ কাজে লাগে বৈকি! তোমাদের বিলাস-সম্ভোগ আরো বাড়াইতে থাক, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়াইতে থাক, ধর্ম্ম-কর্ম্ম আরো হারাইতে থাক,—তা'র মাঝখানে ব্রহ্মচর্য্যের চারাগুলি বেশ গজাইবে বৈকি! বিলাস-লালসার জ্বলন্ত মশাল দুই হাতে লইয়া তোমরা দলে-দলে, পালে-পালে, সমাজের, সংসারের, মানুষের মাঝখানে তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিয়া বেড়াও—তার মাঝখানে নহিলে, এই ম্লান-কান্তি মোমের পুতুলগুলি রক্ষা করিবার এমন সুন্দর স্থান আর কোথায়?—এক বিন্দুও ঘামিবে না! তাই বলিতেছি, কাজে লাগে বৈকি। আর তোমরা লেখা-পড়া শিখিতেছ, রসিকতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে শিখিয়াছ, "আদর্শ-নভেল" লিখিতে শিখিয়াছ,—লেফাফা-দোরস্ত রাখিয়ো, ভাবনা কি? তার মধ্যে যদি দু'টা সংস্কৃত শ্লোক মিশাইয়া প্রবন্ধ লিখিতে পার, তবে সবই বস্তুব হইবে,—ভাবনা কি? পরের মাথায় কাঁঠাল রাখিয়া কোশ খাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত হইয়া বিধবা হইলে, তোমাদের মধ্যে বাস করিয়া তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-গুলি বেশ কাজে লাগে বৈকি? লজ্জাও করে না? আগে নিজেরা শিক্ষিত হও, সমাজকে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপযুক্ত স্থান কর, তখন স্ত্রীশিক্ষা দিতে যাইয়ো। "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা—যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্"! ইংরাজী পড়িয়া, সোনার চসমা চোখে দিয়া, সিল্কের রুমালে ভুর-ভুরে এসেন্স মাখাইয়া, ফুর-ফুরে বাবু সাজিলেই যদি পণ্ডিত হওয়া যাইত, তবে আজ সমাজের এমন দশা কেন? অধঃপাতে গিয়াছ, আমাদের মাটি করিয়াছ, নিজেরা মাটি হইয়াছ, এখন লেক্‌চার ঝাড়িতে লজ্জা করে না? হিন্দু-ধর্ম্মের, হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়াছ, সংযম হারাইয়াছ, সম্বরণ হারাইয়াছ,—তাই-না আজ বিধবার বিবাহের পাপ-প্রস্তাব শুনিয়া কর্ণ-কুহর অপবিত্র করিতে হইতেছে,——তাই-না আজ মরলাকে লইয়া

আমার ভয়! তাই-না আজ আমার অমন দেব-দুর্লভ চরিত্র স্বামী, আমার অমন নির্ম্মল-চিত্ত স্নেহের ভ্রাতা প্রফুল্লকুমার সরলার আবার বিবাহ দিতে প্রস্তুত! সমাজের অধোগতি দেখিয়াই না তাহারা বিচলিত হইয়াছে! নহিলে সরলা আজ বিধবা হইয়াছে, তাই কি হইয়াছে?—হিন্দুর বিধবা দেখিবার জিনিস,—তবে কেন ভয়?

যিনি যাহাই বলুন, যাহাই করুন, সরলার আমি বিবাহ দিতে পারিব না। পূজ্যপাদ ঋষিতুল্য বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"বিধবার আবার বিয়ে?"—ব্রাহ্মণের মত কথাই বলিয়াছেন। আহা, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মোক্ষদা-ঠাকুরাণীকে দেখিলে ভক্তি-ভরে প্রাণ উছলিয়া উঠে,—সেই সুন্দরমুখে কি পবিত্রতা কি দিব্য-জ্যোতি রে! এই তো হিন্দুর বিধবা, এই তো দেবী। যিনি প্রবৃত্তিকে পদাঘাত করিয়া নিবৃত্তিকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি যদি স্বর্গে না যাইবেন, তাঁহার যদি মুক্তি না হইবে,—তবে জ্ঞান মিথ্যা, দর্শন মিথ্যা, ব্রহ্ম মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা! তাও কি কখনো সম্ভব? মোক্ষদা-দেবীর মোক্ষপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আর যতগুলি জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে, তিনি হৃদয়ে অদম্য ক্রম-সংবর্দ্ধমান বল লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে থাকিবেন, অবহেলে প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিবেন, এ বৈধব্য-যন্ত্রণাও আর সহ্য করিতে হইবে না—সৌভাগ্য-রবি এখন হইতে তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য—তিনি নিষ্কামভাবে তাঁ'র মধ্য দিয়া চলিবেন; তাঁহার আর ভয় নাই;—সৃষ্টি যে ক্রমোন্নতিশীল;—যতই বলসঞ্চয় করিবে, বিঘ্ন ততই দুর্ব্বল ভাব ধারণ করিবে, আত্মাপক্ষীর ডানায় বল ততই বাড়িবে, ততই সহজে উঠিবে, স্বর্গীয় বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কথাই আমাদের বুঝাইতেন; সমাজে শিক্ষার দোষে, সমাজের অধঃপতনে হিন্দুর বিধবার বর্ত্তমান অধঃপতন দেখিয়া কত চক্ষের জল ফেলিতেন; বিধবার পুনর্বিবাহ-সম্বন্ধে দত্তজার সঙ্গে কত কথা হইত, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারিতাম না। আহা, সতত চেষ্টা ছিল কিসে আমরা মানুষের মত হই, কিসে আমরা হিন্দুর মত হই;—হায় দেব, আজ তুমি কোথায়? তুমি যে বুঝাইতে, বিকারের রোগী যদি তৃষ্ণা সহ্য করিয়া যায়, তবে আবার সে আরাম হইবে, আবার সুস্থ ও সবল দেহ পাইবে—তখন জল খাইলে আর ভয় নাই। বিকারের রোগী আশু-তৃপ্তির প্রলোভনে যদি অধিক জল খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহার মরণ নিশ্চয়। প্রবৃত্তি সে বিকার,—বিধবার বিবাহ যে তাহার জল! থাক্ আমি ক্ষুদ্র-নারী; রোগ বুঝিয়া, রোগী বুঝিয়া, চিকিৎসকই জল দেওয়া না দেওয়া, কতটুকু দেওয়া, কখন দেওয়া, তাহা স্থির করিবেন। রোগী বিজ্ঞ হয়, আপনি বুঝিয়া চলিবে, কিন্তু তাই কি? তাই কি আমার স্বামী দেবতা সরলার পুনর্বিবাহ দিতে প্রস্তুত? কি জানি আমি মূর্খ। সরলার আবার বিবাহের কথা শুনিলে আমার যে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! তাঁর কাছে বোঝা-পড়া করিয়া দেখিব;—আমার তিনি ভিন্ন আর কে বুঝাইবে? আমার দেবতা! তোমার পবিত্র-চরণোদ্দেশে তোমার দাসী কোটী কোটী প্রণাম করিতেছে।

৩

আমার বাড়ীতে যেদিন সভা হইল, সেই দিন আমার সঙ্গে দত্তজার অনেক কথা হয়,—কিছু শুনাইয়া রাখিব।

সভাভঙ্গের পর অনেকে আমার বাড়ীতেই আহারাদি করিলেন, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আপন-আপন গৃহে ফিরিলেন, তখন দত্তজা আমার ঘরে বিশ্রাম করিতে আসিলেন। আমি

আব্দার ধরিলাম—"তোমায় আজ আমি খানিক বিরক্ত করিব"। তিনি বলিলেন, "অধীন হাজির।"—তাঁ'র কথার ভাবই ঐ রকম।

দুপরবেলা কস্মিন্ কালেও আমরা ঘুমাইতাম না। আমার বাপের বাড়ীরও ঐ নিয়ম, তবে বৌ বড়-মানুষের মেয়ে, তার কথা পৃথক। দত্তজা কিছু-একটা পড়েন, আমি শুনি, আর শেলাই-বোনাই যা-কিছু হাতের কাজ থাকে করি।

আজও দত্তজা একখানি বিলাতী মাসিক পত্রিকা লইয়া বসিয়াছিলেন, আমি তাহা কাড়িয়া লইলাম, নিজেও শুধু-হাতে রহিলাম। দত্তজা একখানি কৌচের উপর বসিলেন, আমি তাঁহার চরণ-প্রান্তে নীচে কার্পেটের উপর বসিলাম। প্রথম-প্রথম, যখন তাঁহার অত্যন্ত সাহেবী মেজাজ ছিল, তখন আমাকে নীচে অমন করিয়া পায়ের কাছে বসিতে দিতেন না। পায়ে তো হাতই দিতে দিতেন না;—আজকাল বড় একটা আপত্তি করেন না। আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, ইহাতেই আমার সুখ, ইহাতেই আমার গৌরব, তাঁহার চরণ-প্রান্তই আমার স্বর্ণ-সিংহাসন, এবং তাঁহার চরণ ধূলিই আমার সীমন্তের সিন্দূর। তিনি আজ-কাল এসকল একটু বুঝিতে শিখিয়াছেন!

আমরা তো বসিলাম; তাঁহার ছোট্ট আহ্লাদে টেরিয়ারটিও আসিয়া আর একখানি কৌচের উপর উঠিয়া বসিয়া আমার দিকে গম্ভীরভাবে চাহিতে লাগিল। আর আর কুকুরগুলি বাঁধাই থাকিত, কেবল শীকারে যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন—"কি জাতীয় বিরক্তিটা হবে, একটু আঁচ পাই না?"

আমি। একটু বাগ্-যুদ্ধ হবে—জিব শানিয়ে লও।

দত্তজা। মেয়ে-মানুষের সঙ্গে বাগ্-যুদ্ধে পারিয়া ওঠে, এমন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে তো আজও আমার দেখা হয় নি—বিশেষ তোমার সঙ্গে।

আ। না হয় হেরেই যাবে,—হাততালি দেবার তো কেউ নেই।

দ। এখন আসল কথাটা কি, বল দেখি।

আ। আসল কথাটা এই যে, সরলার আর বিয়ে দিতে পারবে না। তুমি বলেছিলে যে, চন্দ্রনাথবাবুর সহিত বিচার করে যা সিদ্ধান্ত হয়, তাই করা যাবে। তাঁর কথা তো শুন্‌লে। আমারও তো ঐ মত ছিল। বিধবা-বিবাহের কথা শুন্‌লেই যে আমার গা কেমন করে ওঠে!

দ। হরিদাসের কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছ তো? তিনি একবিন্দুও অযুক্তির কথা বলেছেন কি?

আ। তিনি স্বচ্ছন্দে বল্লেন, আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরাধীন! তাই দেশের এবং সমাজের দুর্গতি।

দ। মন্দ কি?

আ। যে-দেশের লোক অর্দ্ধ-শিক্ষিত, সে-দেশের স্ত্রীলোকেরা পরাধীনা—পদদলিতা হবে, তার আশ্চর্য্য কি? তিনি বলেন, স্ত্রীলোকেরা পরাধীন বলেই দেশের ও সমাজের দুর্গতি। আমি বলি, দেশের ও সমাজের দুর্গতি বলেই স্ত্রীলোকেরা পরাধীনা, পদদলিতা। পুরুষদের শিক্ষার উন্নতি হলেই, সঙ্গে-সঙ্গে, স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হবে। তার প্রমাণ—তোমরা। আর একটি কথা,—"স্ত্রী-স্বাধীনতা" কথাটাই স্বতোবিরোধী।

দত্ত। সে কি? স্ত্রীলোক কি মনুষ্য-জীব নয়? তাহাদের কি স্বাধীনতার অধিকার নেই?

আ। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার কেবল পশুরই আছে। তা' বিশৃঙ্খল স্বাধীনতা—পরাধীনতার নামান্তর-মাত্র। সমাজ-বদ্ধ মানুষের পূর্ণ-স্বাধীনতা কা'রো নেই। যে যেমন উপযুক্ত, এবং যার যে-বিষয়ে যতটুকু স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে আবশ্যক ও নিরাপদ

তার ততটুকুই স্বাধীনতা। তুমি তোমার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিবেশীর অর্থ কেড়ে নিতে পায় কি?—তোমার তো বিলক্ষণ শক্তি-সামর্থ্য, সাহস-শৌর্য্য আছে? এ সকল কথা তুমিই তো বার্কের গ্রন্থ পড়ে শুনাবার সময় আমায় বুঝিয়েছ।

দত্ত। সে তো গেল রাজ্য বা দেশ-সম্বন্ধে। ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা সংযত করে জাতিগত-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্ব্ববিষয়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে বিশৃঙ্খলা আসে, তা হলেই জাতি রক্ষা পায় না, দেশ বিপ্লবময়—অশান্তিময় হয়ে পড়ে।

আ। এই নীতি একবার আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারগুলির বেলায় খাটিয়ে দেখ দেখি। তা হলে দেখবে—স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সংসার বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময় হবার সম্ভাবনা। স্ত্রী যদি পুরুষের কাছে আপনার স্বাধীনতা একটু সমর্পণ করে রাখে, তবে সোনার সংসার হয়। সংসার সুখের হ'লে, পরিবারস্থ সকলেই সে সুখের অংশ পায়; এই নীতি সনাতন। এ ক্ষেত্রে প্রকারান্তরে স্ত্রীর স্বাধীনতাই রক্ষিত হল।

দত্ত। পরিবারে আমি তো স্ত্রী-পুরুষের সমান স্বাধীনতার অধিকারই ধরতে চাই। পাশ্চাত্য দেশে কেমন করে সংসার চলচে?

আ। হাঁ, তাই সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলুম—লণ্ডনে বড় বড় লোকের যুবতী মেয়েগুলোকে পুলিশে পাকড়াও করে জেলে পূরতে বাধ্য হয়েছে; তারা পার্লিয়ামেন্টের ভোট্ চায়। নারায়ণের ইচ্ছেয় যদি তারা ভবিষ্যতে পার্লিয়ামেন্টে স্থান পায়, আর একদিন লেক্‌চার দিতে-দিতে একজনের প্রসব-বেদনা আরম্ভ হয়, তবেই আমার সাধ মিটবে।

দত্ত। তুমি কি বলতে চাও যে, মেয়েরা যুগ-যুগান্তর ঘরে বসে ঘর নিকাতে থাকুক, আর স্বামীর পায়ে হাত বুলাতে থাকুক?

আ। স্বামীর পায়ে যুগযুগান্তর হাত বুলাবেই,—স্বামী বারণ করলেও বুলাবে। তবে চিরকাল কেবল ঘরই বা কেন নিকাতে যাবে?—ঘরও নিকাবে, সবই করবে, আবার শিক্ষাও পাবে। স্ত্রীলোক যতই শিক্ষিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। যে-সমাজের স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত, তারা তো আজো পশু।

দত্ত। কিন্তু শিক্ষা পেলেই আপনার স্বাধীনতা বুঝবে,—পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করবে। স্ত্রীজাতিকে শ্রীচরণের দাসী করে রাখতে হলেই, তা'দের অন্ধ করে রাখতে হয়,—নইলে গতি নেই।

আ। কে বল্লে? অশিক্ষিতা নারীর যে সংস্কার-বশে স্বামী-ভক্তি, তা অন্ধ-ভক্তি,—সেদিন আমাদের যেতে বসেছে। তার পর অর্দ্ধ-শিক্ষিতা নারী,—এরা অনেক স্থলে দায়ে পড়ে লোক-লজ্জা ভয়ে, কোথাও বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বামীকে কপট-ভক্তি করে; আজকাল অধিকাংশই তাই,—এর চেয়ে পাপ আর নেই। কিন্তু নারী সুশিক্ষিতা, জ্ঞানবতী হয়ে যে স্বামী-ভক্তি করবে—এখনই অনেক স্থলে করতে শিখেছে—তাই শ্রেষ্ঠ-ভক্তি, কেন-না তা জ্ঞানাত্মিকা। যেমন অসভ্য অশিক্ষিত জাতি অন্ধভাবে যা-তা পূজো করে, তা অন্ধ-ভক্তি; তাও মন্দের ভাল, কারণ তা আন্তরিক। তার পর, লোক যখন অর্দ্ধশিক্ষিত হয়, অর্থাৎ উপরে উপরে একটু একটু দর্শন-বিজ্ঞান-রসায়নাদি শিক্ষা করতে থাকে, এবং দু'পাঁচটা গবেষণা করে আপন হাতে দু পাঁচটা বৈজ্ঞানিক ভেল্‌কি দেখে, আপনাকে পৃথক এবং স্বাধীনসত্তা মনে করে, ও জড়জগৎকেই সৃষ্টির সবটুকু মনে করে ফেলে—অর্থাৎ ভাবতে শেখে না যে, "এই শক্তি এই-

এই নিয়মে ক্রিয়া না করলে আমি এদের নিয়ে কি করতে পারতুম,—আমার ক্ষমতা কি?” —যতদিন এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-ময় জগতের আদি সত্তাকে বুঝবার মত জ্ঞান ও শিক্ষা না হয়,—ততদিন সে মনে-মনে (কেহ বা প্রকাশ্যে) নাস্তিকতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর-ভক্তিটা অজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করে এবং কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে দেবতাকে প্রণাম করে, অথবা গির্জ্জেয় গিয়ে চোখ বোজে। এই কপট ঈশ্বর-ভক্তি মহাপাপ,—এর চেয়ে প্রকাশ্যে নাস্তিক হওয়া ভাল; যেমন কপট স্বামী-ভক্তি মহাপাপ এবং “অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী”র লক্ষণ। তারপর যখন জ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে থাকে, যখন চাকচিক্যময় যন্ত্রাদিময় রসায়ন-বিজ্ঞানাগারের মধ্যে আর এটি অদৃশ্য অলক্ষ্য হস্ত দেখতে শেখে, তখন যে ভক্তি আসে, তাই-ই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। কেন-না তা জ্ঞানাশ্রিত। তুমি সেদিন সেই Hamiltonএর কথা বলছিলে,—“A learned ignorance is the end of all philosophy and the beginning of religion.” তেমনি জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকের স্বামী-ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি। স্ত্রীশিক্ষা এই ভক্তিই আনবে।

দত্ত। ভাল বুঝলুম না।

আ। এ সকল তত্ত্ব তো তোমারই কাছে শিখেছি। ঈশ্বর-প্রসঙ্গে বলেছ। এখন আমাদের দেবতা, স্ত্রীলোকের দেবতা, স্বামীর পক্ষে খাটিয়ে দেখ।

দত্ত। খাটাও দেখি।

আ। এতো সোজা কথা। অর্থাৎ স্ত্রীলোক শিক্ষার বলে যখন বুঝবে, “স্বামী বাস্তবিকই আমার দেবতা, বাস্তবিকই আমার পূজা, বাস্তবিকই আমার ইহকালে সুখের সোপান, পরকালে স্বর্গের সোপান”,—তখন-যে ভক্তি আনবে, তাহা মনঃ-প্রাণ সিক্ত করে এই তুচ্ছ দেহ-সত্তার ঐ চরণ-প্রান্তে বিলুণ্ঠিত করবে।

কিছুক্ষণ আমি কথা কহিতে পারিলাম না। অতর্কিতে দুই হাতে দুইখানি চরণ বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। কিছুক্ষণ যেন সত্য-সত্যই সংজ্ঞা হারাইলাম। চমক ভাঙ্গিলে দেখিলাম—তেমনি সজোরে তাঁহার চরণ দুইখানি বুকের মধ্যে চাপিয়া আছি, আমার মস্তক তাঁহার উরুদেশে স্থাপিত—মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে —চক্ষে জল; ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি—একলা আমার চক্ষে জল নহে! এই নিষ্কারণ কান্না-কাটির পালা দেখিয়া, এই বিনা-মেঘে বৃষ্টিপাত দেখিয়া বড় লজ্জা হইল; হাসি পাইল! মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলাম,—সে-হাসি তাঁহার মুখেও প্রতিভাত হইল। আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন—আবার নামিয়া বসিতে গেলাম, নামিতে পারিলাম না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি মেয়ে মানুষে জোরে পারে? রাগ করিয়া বলিলাম “আজিও ছেলে-মানুষী গেল না?”

৪

কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই ‘বাস্তবিক’ কথাটা কেন বল্লে?”

আ। এই জন্যই বল্লুম যে, এখনকার অনেক স্ত্রীলোক মনে করে, স্বামী-ভক্তির কথাটা কেবল এ-কালের ঋষিঠাকুরেরা মেয়েমানুষদের আপন বশের মধ্যে রাখবার জন্যই জাহির করেছেন।

দ। মিথ্যা কি?

আ। অমন কথা মুখেও এনো না, তাঁরা পরম জ্ঞানী, যোগী; তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে লোক-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা জানতেন, স্ত্রী-চরিত্র অতি দুর্ব্বল। সাধে কি আর হ্যামলেট্ আপনার মাকে বলেছিল। “Frailty thy name is woman.”! বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হ'লে, স্ত্রীলোক এত নীচে নামতে পারে, তাহা পুরুষে কল্পনা

করতেও পারে না :—কত শুনেছ, স্ত্রীলোকে আপন পুত্র, আপন স্বামী স্বহস্তে কেটেছে! আবার সুশৃঙ্খল অবস্থায়, স্ত্রীলোক যত উচ্চে উঠতে পারে, তোমরা তাও কল্পনা করতে পার না। সাধ্বী নারীরা হাস্‌তে-হাস্‌তে স্বামীর জলন্ত-চিতায় ঝাঁপ দিয়েছেন, আপনার সতীত্ব রক্ষার জন্য অবহেলে বিষপান করেছেন, সতীত্বাপ-হরণ-প্রয়াসীর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করবার সময় কোমল হস্ত বজ্রকঠিন করেছেন। স্ত্রীলোকের স্বর্গও যেমন সুগম নরকও তেমনি সুগম। এইজন্যই ঋষিগণ স্ত্রীলোকের জন্য এত সংযম-নিয়মাদির ব্যবস্থা রেখে গিয়েছেন। ভারতের আর্য্য-ঋষিদের তুল্য স্ত্রীলোকের বন্ধু কে? স্ত্রীজাতি প্রকৃত জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'লে বুঝতে শিখে—সতীত্বের গৌরব হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়।

দত্ত। তবে সমাজের স্ত্রীজাতির আজ এত হীনাবস্থা কেন? আর্য্য-ঋষিরা স্ত্রীকে দেবীতুল্য শ্রদ্ধা করবার জন্য পুরুষকেও উপদেশ দিয়ে যান নাই কি? বঙ্কিমের সেই—"সূর্য্যমুখী আমার স্নেহে মাতা, যত্নে ভগ্নী" ইত্যাদি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য নয় কি?

আমি বলেছি তো, সমাজের পুরুষ-জাতির অধঃপতনই স্ত্রীলোকের হীনাবস্থার কারণ। সময়ের দোষে এবং শিক্ষার অভাবে আজ-কাল সেই-সকল পবিত্র ঋষি-বাক্যের অপব্যবহার হ'তে বসেছে।

দত্ত। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, শিক্ষার দোষে পুরুষ-জাতি স্ত্রীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্য ভুলেছে। শাস্ত্রে বলে, "স্বামী স্ত্রীর দেবতা"—তবে তো আমি দেবতা, এ তো আমার ক্রীতদাসী, আমি যা-ইচ্ছে করলে দোষ নেই,—আমি যে দেবতা! আর এ আমার সেবার একটু নড়-চড় করলেই নরকে যাবে।" এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং স্ত্রীও যে স্বামীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী, তা' ভুলেছে। এখন বড়-বড় বাঙালী লেখকগণও এই কায়দায় নভেল লিখে লোক-শিক্ষা দিতে বসেন। পুরুষের মন উন্নত হ'লে, শিক্ষা-বৃদ্ধি হলে, আবার এই কথা বুঝবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীজাতির সম্মান বাড়বে,—এই তো?

আ। তোমাকে আমি কি বুঝাব? তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই আমার গুরু, যদি কিছু কাণ্ড-জ্ঞান আমার হয়ে থাকে, তবে সে তো তোমা হতেই।

দত্ত। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অতি পবিত্র। এই পবিত্র জাতি অপবিত্রতা প্রাপ্ত হ'লে তাহার অপেক্ষা নীচ, ও তাহার অপেক্ষা ঘৃণ্য আর কিছুই থাকে না। স্ত্রীলোক স্বভাবপবিত্র,—ডেস্‌ডেমোনা রামায়ণ-মহাভারত পড়তে আসে নি;—কিন্তু তা'র মত সতী রামায়ণ-মহাভারতেই বা কয়জন বাহির করতে পারেন? সবই তো বুঝলুম, কিন্তু তাই বলে পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনতার পূর্ণ তার অধিকার প্রাপ্য নয় কেন?

আ। পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ-স্বাধীনতা সে চায় না, উহা স্ত্রী-চরিত্রের বিরোধী।

দত্ত। তবে ইউরোপ-আমেরিকার স্ত্রী-লোকেরা পুরুষের কাছে একবিন্দুও বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না কেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বা সমান অধিকারের জন্য কেন লড়ছে! তারা কি স্ত্রীলোক নহে? বরং ভারতের রমণী অপেক্ষা তা'রা সহস্র-গুণে শিক্ষিতা।

আ। তাদের মধ্যে অনেকেই—বোধ হয় সব গুলিই কুমারী,—আজো স্বামী পায় নি। আমি বলচি স্ত্রীলোক কেবল স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পণ করবে, আর কারো কাছে নয়। বরং অন্যের কাছে তার সম্মান-সম্ভ্রমের দাবী পুরুষ অপেক্ষাও অধিক। যখন স্বামী পাবে,

তখন স্বামী যদি তা'কে পার্লিয়ামেন্টে যেতে দেন, অথবা নিজে সঙ্গে নিয়ে যান, সে তো বেশ কথা। স্বামীর পার্শ্বে ঘোড়ায় চড়ে সে কেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাক্ না; মানব-সমাজের শিক্ষার এবং জ্ঞানের উন্নতি হ'লে, নারী তো এমনি করবে—কিন্তু স্বামীর সঙ্গে, স্বামীর অনুমতিক্রমে। অর্জ্জুন যখন সুভদ্রাকে হরণ করেন, তখন সুভদ্রা-ঠাকুরুণের কাণ্ডটা মনে আছে তো? তাঁরা বাঙালীর "বৌমা" ছিলেন না। খনা, লীলাবতীও বাঙালী বাবুর "কোণের বৌ" ছিলেন না। তখন সমাজ কত উন্নত ছিল।

দত্ত। স্বামীর অনুমতির আবশ্যক কি?

আ। প্রকৃতির নিয়ম। ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যেখানে এর অভাব দেখিতে পাও, সেখানে বুঝ্তে হবে, ইহা ব্যতিক্রম, অর্থাৎ পাপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম নয়। সংসারে ব্যতিক্রম না থাকলে নিয়ম দাঁড়াবে কিসের উপর? ব্যতিক্রম পশুত্ব, নিয়মই মনুষ্যত্ব। স্বামীর কাছে স্ত্রীর বশ্যতা স্বাভাবিক।

দত্ত। কখনই নয়। কেবল অভিশপ্ত হিন্দুর ঘরে ভিন্ন সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের সমান স্বাধীনতা, সমান কর্ত্তৃত্ব।

আ। দেখ, সভ্যতার লক্ষণ তা নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ তা নয়! দেখ না, ইতর জীবের মধ্যেও যেগুলি সভ্য হয়েছে, তারাও দম্পতি-বন্ধনে বাস করে। এবং তাদের স্ত্রীর সতীত্ব দেখে স্তম্ভিত হতে হয়,—তারা তো ঋষি-ঠাকুরদের স্বামি-ভক্তির শাস্ত্র পড়ে নাই!

দ। কিন্তু স্বাধীনতা তো আছে।

আ। তারা প্রকৃতির নিয়মে চলে—স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে জানে না। আরো কথা এই যে, তাদের পারিবারিক জীবন নেই। রাত্রি হল, ব্যাঘ্রী আহারান্বেষণে ছুটল, ব্যাঘ্র অন্যদিকে ছুটল। তাদের কার্য্য—আহার ও নিদ্রা। কিন্তু মানুষকে ঘর-সংসার পাতিয়ে সমাজ পাতিয়ে, শাসন-তন্ত্র পাতিয়ে, বাস করে, আত্মার উন্নতি-সাধন করতে হয়,—তার কথা পৃথক। স্বামীর কাছে স্ত্রীর অনেক ঋণ, স্বামী তার দেবতা। মানুষের আত্মা উন্নত; তার প্রেম-ভক্তি আছে, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ো-জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-জ্ঞান আছে, এজন্য পাপ-পুণ্য আছে।

দ। সবই মানলুম, কিন্তু পুরুষের উপর স্বাধীনতা স্ত্রী-জাতি চায়না"—একথা কেন বল্লে?

আ। অন্য পুরুষের উপর কেন চাইবে না? —অন্য পুরুষ কোথাকার কে? কেবল স্বামীর উপরই চায় না,—ইহাই নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। নারী যাকে "ভালবাসে" অর্থাৎ স্বামী—তার পায়ের তলায় আপনিই লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষ নারীকে ভালবাসলে তার পায়ের তলায় গড়ান না। লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে, বৃক্ষ লতাকে আশ্রয় করে না। যে স্ত্রী পুরুষের মাথায় চড়্তে চায় তার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে; অথবা সে যে পুরুষের মাথায় চড়্তে পারে, সে পুরুষ তার স্বামী হবার যোগ্য নয়—গোলাম হবার যোগ্য। এই জন্যেই তো আধুনিক হিন্দু পুরুষেরা স্ত্রীজাতিকে অশিক্ষিত রাখ্তে ব্যস্ত। তাঁরা নিজেরা কাপুরুষ, এজন্য মনে করেন 'স্ত্রীলোকেরা উন্নত হলে আমরা আর তার স্বামী হবার যোগ্য থাকব না—যেহেতু আমরাই অনুন্নত, অক্ষম, হীনবল এবং নিস্তেজ। স্ত্রী-জাতিকে সেই অনুপাতে নীচে রাখতে হবে।' বলেছি তো, পুরুষের উন্নতি হলেই স্ত্রীজাতির উন্নতি আপনি হবে। অর্জ্জুনকে একটি "লক্ষ্মী-শান্ত" ঘোমটা-দেওয়া বাঙালীর বৌ দিতে গেলে তিনি তাকে বিয়ে করতে রাজী হতেন কি? যে ধনু রামচন্দ্র ভঙ্গ করেছিলেন, সেধনু কে বল সীতা-

সেবীই বাম হস্তে অনায়াসে উত্তোলন করতে পারতেন। তুমি কি মনে কর, ইউরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলে, সেখানে সকল স্ত্রীই স্বামীর অবাধ্য? অসম্ভব। তা হইলে তাঁরা আজ এত বড় হতেন না। সেখানে এমন কোটি-কোটি নারী নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা স্বামি-ভক্তিতে স্বামি-সেবায় স্বামীর ইচ্ছানুসরণে, হিন্দুনারী অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নন্। তাঁরা আপনাদের সতীত্বের গুণে সংসারে শান্তি রেখেছেন। স্ত্রীলোকের মনেও সেখানে এক বিন্দু ব্যভিচার ঢুকেছে, সে সংসার ছারখারে যায়—সে নারী নরকের আগুনে জন্ম-জন্ম দগ্ধ হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত থাকতে পারে না। পশুরা পারে, অসভ্য মানুষেরাও পারে। কিন্তু যতই মানুষ সভ্য হবে, পুরুষের সাহায্য স্ত্রীজাতির ততই অধিক আবশ্যক হবে। পুরুষ কর্ত্তা (creative), স্ত্রী কর্ম্ম (receptive). পুরুষের বশীত্বস্বীকার স্ত্রী-হৃদয়ের স্বাভাবিক উৎস, স্বাভাবিক ধর্ম। দেখনা, মিরাণ্ডা কখনো পিতা ভিন্ন অন্য মানুষ দেখে নি, সমাজ দেখে নি, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-জ্ঞান তার নেই, কিন্তু ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখ্‌বা-মাত্র আত্মসমর্পণ করে ফেল্লে!—উচ্ছ্বাস-স্বরে, নির্লজ্জ-ভাবে বলে ফেল্লে—

I am your wife, if you will marry me,
If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

ক্লিওপেট্রা অত জাঁহাবাজ সুলতানা! তবে সেইটা আবার সাপের কামড় খেয়ে বুকের জ্বালা মিটাতে হল কেন?—সখের প্রাণ থাকলে অনেক এ্যান্টনি তো মিলতে পারতো। ইহাই যে স্ত্রী-হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি, জগতের শ্রেষ্ঠ কবি তা' বুঝতেন।

দত্ত। কিন্তু সব সমাজেই, সব ধর্ম্মেই স্ত্রী-লোকের সংযমের উপর অধিক লক্ষ্য কেন?

আ। কারণ সব সমাজেই জ্ঞানী লোক থাকেন এবং সকল ধর্ম্মই জ্ঞানী লোকের আবিষ্কার।

দত্ত। আমি বলি, এ-সব কড়াকড়ি ব্যবস্থা, পুরুষ-জাতির জবরদস্তি।

আ। জবরদস্তি নয়—জ্ঞানের পরিচায়ক। মনে কর, যদি জবরদস্তিই হয়, তথাপি স্ত্রীলোক এই জবরদস্তির অধীন হয়ে চললে, তারাও সুখী হয়, সমাজও সুখী হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ সমাজ-নীতি। যতটুকু স্বাধীনতার অধিক যে পরিপাক করতে পারে না, তাকে তার বেশী স্বাধীনতা দিলেই সব দিকে গোল বাধে।

দত্ত। আর পুরুষ যা ইচ্ছে করবে?

আ। কখনই নয়। পুরুষ অজ্ঞানতা-বশতঃ একটু-আধটু বিশৃঙ্খল হলেও সমাজে ততটা অশান্তির ভয় নেই। কিন্তু স্ত্রীলোকের চরিত্রে বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করলে আর রক্ষা নেই। স্ত্রী-জাতি স্বভাবতই পুরুষের মাতৃস্থানীয়া, যা কা'রও গোলাম হয়? আমি এই বলছি যে, কেবল স্বামীই স্ত্রী-জাতির সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য, এবং স্বামীর যিনি পূজ্য, তিনি অবশ্য স্বামীর খাতিরেই পূজ্য, কিন্তু তা বলে স্বামীর কাছে তাঁর সম্মান আছে। যে স্বামী গায়ের জোরে এই সম্মান না করেন, তিনি তো কাপুরুষ, নরাধম, বর্ব্বর! স্ত্রীলোকের কাছে যে গায়ের জোর খাটায়, পুরুষের কাছে সে কখনই গায়ের জোর খাটাতে পারে না—সে যে কাপুরুষ! আজ-কাল অনেক পুরুষ স্ত্রীর গায়ে হাত পর্য্যন্ত তোলেন শুনতে পাই, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, বাড়ীর বাইরে একটি পাঁচ বছরের ছেলের

গায়েও তাঁর হাত তুলবার সাহস হয় না। একটা সামান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে সভ্যভাবে কথা বলতেও তার ঠোঁট কাঁপে। বঙ্কিমবাবু দেবীচৌধুরাণীর শেষে বলেছেন, "যেখানে বিদ্যা-প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যার বিদ্যা প্রকাশ পায় সেই মূর্খ;" আমি বলি, যেখানে বাহাদুরী প্রকাশের স্থান নয় অর্থাৎ অন্তঃপুর, সেখানে যার বীরত্ব প্রকাশ পায় সেই কাপুরুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ-কাল বাঙালীবাবুর পুরুষত্বটা অন্দর-মহলেই বিকাশ পায়, জাতিও তেমনি দিন-দিন ভীরু—কাপুরুষ হয়ে পড়েছে।

দ। কিন্তু স্বামী মন্দ হ'লে স্ত্রীর মেজাজ কতক্ষণ ঠিক থাকে? তারাও তো আর দেবতা নয়, শাস্ত্রের উপদেশের কতটুকু ক্ষমতা? শাস্ত্র "নিমপাতা মিষ্ট লাগা উচিত" বলে শ্লোক লিখলে, নিম্‌পাতা মিষ্টি লাগবে কি? স্বামী কুশ্রী—স্ত্রী সুশ্রী, স্বামী অসৎ—স্ত্রী সচ্চরিত্রা, স্বামী মূর্খ—স্ত্রী সুশিক্ষিতা, স্বামী নির্বোধ—স্ত্রী বুদ্ধিমতী, স্বামী ভীরু কাপুরুষ—স্ত্রী তেজস্বিনী ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বামি-ভক্তি কেমন করে আসবে? শাস্ত্র এখানে কি করবে? ইমার্সন্ তাঁর Representative Men এ—Swedenborg প্রসঙ্গে বলেছেন—"you love the worth in me, then I am your husband" —ঠিক কথা নয় কি? যে আমাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নীচ বলে আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, তার প্রতি ভক্তি, তার কাছে আত্ম-সমর্পন কেমন করে আসবে?

আ। যে-কথা বল্‌লে তা সত্য আমাদের সমাজের -বধূ-নির্ব্বাচনের ভার পিতা-মাতার, কিন্তু তাঁদের সে ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয়। পুত্র-কন্যার বিবাহ দিবার সময় পিতা-মাতাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইউরোপে এ ভয় বড় নেই,—এখানে আছে। পিতার দারিদ্র্য-বশত এবং কৌলিন্যাদি সমাজের অনিষ্টকর প্রথার জন্য পরম-সুন্দরী ও সর্ব্বগুণময়ী কন্যাকে হয় তো একটা জড়ভরত নরপ্রেতের হস্তে সমর্পণ করতে হয়। হয় তো বরের বাপের কিছু অর্থ আছে। এরকম ক্ষেত্রে কন্যার পক্ষে নিশ্চয়ই বড় সঙ্কটাবস্থা দাঁড়ায়।

দ। নিশ্চয়ই তাই।

আ। তুমি পুরুষ মানুষ বলে, এবং অনেক দিন সাহেব-ঘেঁসা হয়েছিলে বলে এরূপ মনে কর। সেদিন দুপুরবেলা "Autocrat of the breakfast table" পড়ে শুনাচ্ছিলে—গ্রন্থকার বলছেন,—"প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক স্ত্রীলোককে ভালবাসে, এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রত্যেক পুরুষকে ভালবাসে,—যদি-না কোনও অন্তরায় (বোধ হয় অসৌন্দর্য্য ইত্যাদি) তার বিপরীত করতে বাধ্য করে।" কথা অবশ্যই সত্য,—গ্রন্থকার একজন বিশেষ জ্ঞানী লোক। কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত রসিক লেখক। তিনি natural affinity of the opposite sexes এই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মই mean করে ও-কথা বলেছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের দর্শনমাত্রই ভালবেসে ফেলা—Love at first sight—তাও ঐ জাতীয় কথা। কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু এ ভালবাসা নিকৃষ্ট, ইহা ইন্দ্রিয়-গন্ধ-দূষিত। ইহা পশুরও আছে। কিন্তু আমরা উন্নত জীব, আমাদের আত্মা উন্নত, আমাদের পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব আছে, এ-জন্য দাম্পত্য-প্রণয় ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চে। দাম্পত্য-প্রণয় অনেক স্থলে এই জাতীয় ভালবাসার উপর প্রতি-ষ্ঠিত হয়, এবং এই জন্যই তা সহজে সুদৃঢ় এবং সুন্দর হয়, এবং তাই-ই বাঞ্ছনীয়। সুখ দেখে আমি চুরি করতে জানি, অতএব আমার সুখে দাবী আছে' এই মতলবে চুরি করতে গেলে একজন্মে স্বর্গাই ও দণ্ডার্হ হ'ব, এবং কুপ্রবৃত্তিকে

মনে স্থান দেওয়ায় আমাকেও কলুষিত করে নিয়ে চল্‌ব।

দ। অর্থাৎ স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী নিকৃষ্ট হলে, স্ত্রী যে মনে করবে "এর চেয়ে ভাল স্বামী ও অধিক সুখে আমার দাবী আছে"—সেটা ভুল; যেমন ঈশ্বর দিয়েছেন, তাই আশ্রয় করে, তাই আত্মার উন্নতির সোপান মনে করে, তাতেই বিশুদ্ধ-চিত্তে রত থাকা স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম?

আ। অনেকটা বুঝেছ। তুমি তো সবই বোঝো।

দ। না সরোজিনী, এ সব অনেক কথা আমি বুঝি নে, বুঝতে চেষ্টাও বড় করি নে। তুমি আমার কাছে লেখা-পড়া শিখেছ, কিন্তু এ সব তো আমি কখনো তোমায় বুঝাই নি। কেমন করে তোমার এসকল জ্ঞান হয়,—আমি তো বুঝতে পারি নে।

আ। আমার কি জ্ঞান হয়েছে? আমি ক্ষুদ্র-নারী। তবে এই দেশেই খনা লীলাবতী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের শিখালে আমরাও হয়তো মানুষের মত হতে পারব।

দত্ত। লেখা-পড়া তো অনেকেই জানে, তবে সকলেই তোমার মত হয় না কেন?

আ। একই বীজ সিলেটে পুঁতলে কমলা লেবু হয়, বাংলায় পুঁতলে গোঁড়া লেবু হয়। আমি হিন্দুর মেয়ে।

দ। আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হলে স্বামি-ভক্তির আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝবে এবং হিন্দুর সংসার সোনার সংসার করবে, এই যে কথাটি বলেছ তা কেমন করে করবে আমায় বুঝাও দেখি?

আ। আমি তো কিছুই বুঝি নে, আমি কিছুই শিক্ষা পাই নি, আমি কখনো কষ্টে পড়ি নি, আমি কেমন করে তোমায় বুঝাব? তোমার পদতলে মস্তক রাখতে তো শিক্ষার বা জ্ঞানের আবশ্যক করে না—মস্তক যে আপনিই লুটিয়ে পড়ে! যাকে যুদ্ধ করতে হয় যুদ্ধনীতি তারই শিখতে হয়। আমার তো ভাগ্যের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করতে হয় নি।

এমন সময় হিমী পরদার বাহির হইতে ডাকিল,—"মা, মামাবাবু এসেছেন।" নীচের বৈঠকখানায় হারমোনিয়মের বাজনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম প্রফুল্ল আসিয়াছে,—তাহার হাত আমি চিনি। ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে লাফাইতে লাফা-ইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বলিল, "মেজদি, আমি তাহিরপুর যাব; নিউমোনিয়া রোগী, বোধ হয় রাত্রে আসতে পারব না,—বাড়ীর দিকে নজর রেখো।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু খেয়ে বেরিয়েছিস্?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিল, "না।" সরলা ভয়ে কোনো বিষয়ে বড় একটা হস্ত-ক্ষেপ করে না। বড় মানুষের মেয়ে হ'লে নিজে বুদ্ধি খরচ করে এ সকল বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করার বুদ্ধি থাকতে নাই। কাজেই প্রফুল্ল খাবার না খাইয়া বেলা সাড়ে-তিনটার সময় ভিন্ন গ্রামে রোগী দেখিতে যাইতেছে। আমি নিজের হাত থাকিতে কাহাকেও বাজার হইতে খাবার আনিয়া খাওয়ানো বড় বাহাদুরী মনে করিতাম না। কিন্তু আজ তাহা হইয়া উঠিল না। ঝগড়া করিয়া বেলা সাড়ে তিনটা বাজাইয়া ফেলিয়াছি। এদিকে প্রফুল্লও কাপড়-চোপড় পরিয়া আসিয়াছে, বিলম্ব সহিবে না। কাজেই ঘরে বাজারের খাবার যাহা-কিছু ছিল, তাহাই আনিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দুই জনে খুনসুটি আরম্ভ করিয়াছে। দত্তজা প্রফুল্লর নেকটাই খুলিয়া দিয়াছেন, প্রফুল্ল দত্তজার টেরী ভাঙিয়া দিয়াছে। এই দুইজন একত্র হইলেই প্রায় এইরূপ হইত। দুটিই সমান। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রাজভক্তি *

বাজিছে দামামা সুগভীর রবে
রণ ভেরী পুনঃ উঠিছে গর্জ্জিয়া।
সাজ বীরসাজে ভারত-নিবাসী—
ভারতের দিন আসিছে ফিরিয়া।
কে বলে বাঙালী কাপুরুষ জাতি?
দাসত্বই তার জীবনের ব্রত।
কে বলে বাঙালী ঘৃণিত অধম—
প্রাণ-ভয়ে সদা আকুল আনত।
রাজভক্ত প্রজা, রাজার কল্যাণে
বীরসাজে পুনঃ এস গো সাজিয়া।
শত্রুর রক্তে নিবারিয়া জ্বালা
স্বদেশের শান্তি দাও গো রাখিয়া।

ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য
আবার দেখাও ভারত-সন্তান!
ভারত-রমণি, আবার তোমরা
অভয়-ব্রতের কর অনুষ্ঠান।
সাজ বীরসাজে ভারত-সন্তান!
পূর্ব্বের গৌরব হইল উদয়
নশ্বর জীবন চিরস্থায়ী নহে
হও অগ্রসর কি ভয় কি ভয়?
নহে হীন জাতি—নহে কাপুরুষ
নহে ধর্ম্মহীন ভারত-তনয়।
মরিয়া অমর হইতে সে জানে
যশোরশ্মি আজো সে ললাটে বয়।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা।

হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষার যে বিশেষ আবশ্যকতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে যদি একজন সুশিক্ষিত ও অন্যজন অশিক্ষিত থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যে একতা হওয়া দুঃসাধ্য! যেখানে পতি-পত্নীর ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ থাকে সেখানে সুখ কি-প্রকারে হইতে পারে? যদি সমাজের এক অঙ্গ সুশিক্ষিত ও অন্য অঙ্গ অশিক্ষিত থাকে তবে পরিণাম দুঃখময় হইবেই হইবে। যদি সমাজের উভয় অঙ্গকেই সুশিক্ষা দেওয়া হয় তবে উভয়েই উন্নতিমার্গে আরূঢ় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রী সুশিক্ষিতা হইলে সে যে কেবলমাত্র পবিত্রভাবে গৃহকার্য্য করিবে ও যথাশক্তি পরস্পরকে সহায়তা করিবে, তাহা নহে; বরং সমস্ত জাতির চরিত্রগঠন এবং উন্নতিসাধনে সম্মিলিত হইয়া পরিশ্রম করিবে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যে কুসংস্কার এবং অনিষ্টকর দেশাচার দেশকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহার উচ্ছেদের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ

* চন্দন-নগরবাসীদিগকে সমর-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত।

একযোগে একপ্রাণে এক স্থানে বসিয়া উপায় উদ্ভাবন করিবে। এইরূপে উঁহারা সম্মিলিতভাবে উচ্চ জ্ঞান ও সংস্কার-প্রভাবে সমস্ত সমাজের এবং পরিবারের সংস্কারসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

বিদ্যাবলে মানব কি না করিতেছে? বিদ্যার প্রভাবে মানব ভূমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াই বিরত নহে, লক্ষ যোজন দূরস্থিত অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলও তাহার আলোচ্য বিষয়। সে পৃথিবীস্থ হইয়াও অসীম সৌরজগতের গ্রহোপগ্রহ-নক্ষত্র-পুঞ্জের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নক্ষত্রমালার সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম গন্তব্য পথ অবধারণ করিয়াছে; চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গ্রহণ গণনা করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে! জাজ্জ্বল্যমান সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যস্থিত অলক্ষ্য কালিমা নির্ণয় করিয়া লোকসমাজকে চমৎকৃত করিতেছে! অচলা পৃথিবীর সচলতা সিদ্ধান্ত করিতেছে —অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, ঈদৃশ অলৌকিক তত্ত্বাবলীর আবিষ্কার করিতেছে। মনস্বী মানব পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব-সকল আলোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। কে এ সকল অলৌকিক কাণ্ডের প্রবর্ত্তক! বিদ্যা-বিভা আর কিছু নহে "বিভা অধ্যয়নজ সংস্কার।" অধ্যয়ন অর্থাৎ শিক্ষার জন্ত সংস্কার মাত্র।

স্ত্রী-শিক্ষা আজ নূতন বিষয় নহে। পুরাকালেও রমণীগণ সুশিক্ষিত হইতেন। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, দেবহুতী, গার্গী, রুক্মিণী, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি প্রমদাবর্গ স্ত্রী-শিক্ষার সুমধুর ভাব ভারতে অনেক দিন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কে বা বিদিত নহেন। অনেকের মত এই যে রমণীগণের শারীরিক ও মানসিক কোমলতা বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায়, কিন্তু তাহা কিরূপে হইতে পারে। তাহা আমাদিগের ধারণার অতীত।—বরং কোমল অন্তঃকরণই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগি। যখন বালকের কোমল হৃদয়ে বিদ্যার বীজ অতি সহজেই এবং শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয় তখন রমণীগণের হৃদয়ে হইবে না কেন? সমাজের অর্দ্ধভাগ স্ত্রীজাতির দ্বারা অধিকৃত। স্ত্রীশিক্ষা অপ্রচলিত হইলে সমাজের অর্দ্ধাংশের সহিত বিদ্যালোকের কোনও প্রকার সংস্রব থাকিবে না। চন্দ্রমণ্ডল এবং সুমেরুর ন্যায় মনুষ্যসমাজের একার্দ্ধ উজ্জ্বল আলোকদ্বারা আলোকিত এবং অপরার্দ্ধ সদা অন্ধতমসাচ্ছন্ন থাকিবে। এরূপ সিদ্ধান্তের আমরা পক্ষপাতী নহি। যে বিদ্যা অন্নবস্ত্রাপেক্ষাও উপাদেয় এবং আবশ্যক তাহা হইতে স্ত্রীজাতি বঞ্চিত থাকিবে—ইহা নৈসর্গিক-নিয়মবিরুদ্ধ। শিক্ষার ফল অনেক। জ্ঞানলাভ করিলে কেবল যে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় তাহা নহে, উহাদ্বারা হৃদয় সুকোমল হয়, ইচ্ছা বলবতী হয়, ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যপালনে নৈপুণ্য ও বল জন্মে। শিক্ষাদ্বারা যে কোন সত্য অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা স্বভাবতঃ চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে পরিণত হয় এবং মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগের পুষ্টি সম্পাদন করে। যখন পুরাকালে রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন তখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না —মতান্তর কেবলমাত্র তৎসাধনের উপায়গুলিতে।

শিক্ষা দুই প্রকার—বাহ্যিক এবং আন্তরিক। আমরা অন্যের দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিক্ষা করি তাহা বাহ্যিক। এবং যে-শিক্ষার দ্বারা অন্তরস্থ বৃত্তিসকল প্রস্ফুটিত হইয়া কার্য্যক্ষম হয় তাহা আন্তরিক। বাহ্য-শিক্ষা আন্তরিক-শিক্ষাদ্বারা দৃঢ়ীভূত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না এবং তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। যাহারা জ্ঞান-দুর্ব্বল, নিজে নির্ব্বাচন-শক্তি-

বিহীন, তাহারা ধাঙ্গ-দর্শনে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এই বিমুগ্ধতা হইতে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হয়। এইজন্য শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি-বিহীন হওয়া উচিত নহে। নারীগণকে শিক্ষা দিতে হইলে ধর্ম্মহীন-শিক্ষা দেওয়া কোনও মতেই বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাহারাও যুবকগণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইবে। একমাত্র জ্ঞানের উন্নতিসাধন করিলে হৃদয় উন্নত হইবে, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যেমন জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইবে, সেইরূপ হৃদয়ের পরিপুষ্টির জন্য অপ্রেম, দ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অপসারিত করিয়া পরার্থে আত্মবলিদান দিতে হইবে। যে গভীর জ্ঞান-স্পৃহা মানুষের সুখভোগে উন্মত্ত হইতে দেয় না, যে গভীর জ্ঞানচর্চ্চা করিতে যাইয়া জ্ঞানপিপাসু আত্মবিস্মৃত হইয়া যান, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনে সেই জ্ঞানপিপাসার সৃষ্টি করিতে হইবে। আবার হৃদয়ে যে প্রেমসঞ্চার হইলে মানুষ নরনারীর সেবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেই প্রেম রমণীগণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বলিলে এখন আমরা বুঝি, যে শিক্ষায় রমণীগণ নাটক-নভেল পড়িতে পারে, চিঠিপত্র লিখিতে পারে। আর আমাদিগের পিতামহ প্রপিতামহগণ বুঝিতেন,—যাহা-দ্বারা ধাক্য মনে পবিত্রতা রক্ষিত হইতে পারে, মহীধর-কেও সহিষ্ণুতায় পরাজয় করিতে পারে, সেবায় দ্রৌপদীর সমান হয় এবং সংসারে অন্নপূর্ণার ন্যায় বিরাজ করে। কাজেই হিন্দুগৃহ তখন শান্তিনিকেতন ছিল। তখন হিন্দু-রমণীর আদর্শ ছিল—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী। আজ-কাল ধর্ম্মহীন শিক্ষার দোষে রমণীগণের দয়া, কোমলতা, বিনয়, লজ্জাশীলতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, এবং নিঃস্বার্থভাব প্রভৃতি বিলুপ্ত করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানাভিমানিনী, স্বার্থপরায়ণা, সভ্যতার নামে বিলাস ও সুখপ্রিয়া অথবা অহঙ্কৃতা ও গুরুজনের প্রতি ঘৃণাপরায়ণা এবং সংসারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। এ শিক্ষা আরো কিছুদিন প্রাপ্ত হইলে কাল-সহকারে কমনীয়া কামিনী-প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ করিবে।

স্ত্রী জগৎ-প্রসূতি—জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী। স্ত্রী পবিত্র, প্রেমময়ী ও সাধ্বী হইলে কুল পবিত্র, জাতি পবিত্র ও দেশ পবিত্র হয়। সংসারে তাহা-দিগের দায়িত্ব অধিক। তাহাদিগকে এক দিকে হৃদয়-তোষিণী ও অন্যদিকে সন্তানের স্নেহময়ী জননী, একদিকে ভ্রাতার আদরের ভগিনী ও অন্যদিকে পিতামাতার সেবা-পরায়ণা কন্যা হইতে হইবে। যাহাতে তাহারা নিরাশায় আশা, অশান্তিতে শান্তি, বিপদে ধৈর্য্য, ধর্ম্মে সহায়, দুঃখে দুঃখিনী, সুখে সুখিনী, রোগে পার্শ্ববর্ত্তিনী, পরামর্শে বন্ধু, চরিত্রের শাসনকর্ত্রী, দাসদাসীর পালয়িত্রী, গৃহের লক্ষ্মী, সমাজ-বন্ধনীর মূলরজ্জু ও সমাজ-দেহের মূল অস্থি হইতে পারে, তন্নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। দম্পতির মধ্যে স্ত্রী সাধুপ্রকৃতি না হইলে পুরুষ কখনই পূর্ণহৃদয় ও সুপথগামী হইতে পারে না। গৃহলক্ষ্মী সৎ-প্রকৃতিস্থ না থাকিলে সংসারে ধর্ম্মের ও পবিত্রতার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। কুলমহিলাগণের শাস্ত্রশিক্ষা ও নৈতিক নিষ্ঠা জাতীয় প্রকৃতি-গঠন ও সামাজিক উন্নতির প্রধানতম উপাদান।

সাহিত্য, অঙ্ক-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, সূচি-কার্য্য, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য-তত্ত্ব এবং শিশু-পালন স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। পারিবারিক কার্য্যে নিপুণতা লাভ করা রমণীগণের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গৃহমার্জ্জনা, বস্ত্র ও শয্যাদি পরিষ্কার রাখা, রন্ধন ও আহারের আয়োজন, দৈনিক ব্যয় ও উহার হিসাব, ভৃত্যশাসন এবং অতিথিসেবা এই কয়েকটি সাংসারিক কার্য্যে

রমণীগণকে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা না হন, তাঁহার অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তাঁহাকে সকলে নির্গুণ ও অপদার্থ বলিবে। যে-গৃহে সমস্ত সামগ্রী সুন্দররূপে যথাস্থানে স্থাপিত, যে-গৃহে সাংসারিক কার্য্য প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যথাসময়ে নির্ব্বাহিত হয়, যে-গৃহে পারিবারিক সদ্ভাব ও কুশল নিয়ত বিরাজ করে; ও দাস-দাসী সকলে সুশাসিত, যে-গৃহে অতিথি-সেবার কোনো ত্রুটি হয় না, সেই গৃহের কর্ত্রীকে আমরা সুশিক্ষিতা বলি। শিশুপালন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য-মধ্যে একটি গুরুতর ব্রত, শিশু সন্তান যখন গর্ভে থাকে, তখন হইতেই উহার প্রতি মাতার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়। যাহাতে উহার শরীরের রক্ষণ ও যথারীতি বর্দ্ধন হয় এবং কোনোপ্রকারে উহার অঙ্গবৈকল্য অথবা অসুস্থতা না হয়, মাতা সর্ব্বদা এমত চেষ্টা করিবেন। ভূমিষ্ঠ হইলে উপযুক্ত ধাত্রীর সাহায্য ও সূতিকাগৃহের নিয়মাদি পালন পূর্ব্বক ঐ সন্তানকে রক্ষণ-পালন করিতে হইবে। শৈশবাবস্থা হইতে বাল্যাবস্থায় উপনীত হইলে সন্তানের শরীর ও মন উভয়েরই ভার মাতার হস্তে ন্যস্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না বিদ্যালয়ে যাইতে সক্ষম হয়, ততদিন বালক-বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও নীতি-শিক্ষা জননী দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। যাহাতে অসভ্য ও পাপাচারী ভৃত্য অথবা অন্য কোনো মন্দ লোকের সংসর্গ বা দৃষ্টান্তে পুত্র-কন্যাগণ মন্দ পথে না যায়, তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে এরূপ শাসনে রাখিবেন। নারীর হৃদয় অতি কোমল, এজন্য অনেক মাতা অতিশয় স্নেহে অন্ধ হইয়া সন্তানদের দোষের প্রতি উপেক্ষা করেন ও প্রশ্রয় দেন। সন্তান যাহাতে কুচরিত্র হইয়া জনসমাজের অনিষ্টসাধন না করিতে পারে, এ সমস্ত তথ্য মাতার অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

শৈশবকাল থেকেই যাঁদের শ্রদ্ধা করতে শিক্ষা করেছি, যাঁদের নাম শুনলে চিত্ত আপনা হতেই সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। যখন শিশু ছিলাম, তখন ভাবতাম লোকে এঁকে মহর্ষি বলে কেন, কেন এঁর নামোচ্চারণ করতে লোকের কণ্ঠ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে ওঠে, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌তাম না। জ্যেষ্ঠ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম খুব বড় ঋষিকে মহর্ষি বলে; কিন্তু এতে কথাটার অর্থ যে আমার কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তা বল্‌তে পারি নে। পরে যখন স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় বর্ণের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল, তখন একদিন একটি চিত্র-সম্বলিত লেখা পড়্‌লাম "ঋষি মশাই বসে পুজায়"; এই চিত্রটির সঙ্গে গৃহস্থিত মহর্ষির আলোকচিত্রের তুলনা করে দেখ্‌লাম যে, উভয়েরই দাড়ী আছে। সে-দিন আমার শিশু মস্তিষ্কের কাছে এই দাড়ী থাকাই মহর্ষিত্বের পরিচায়ক চিহ্ন হয়েছিল।

তারপর একদিন শুভমুহূর্ত্তে তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই বাণী শুনেছিলাম, তখনো আমার বয়স খুবই অল্প। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যাঁরা সেই সৌম্যসুন্দর শান্ত অথচ তেজঃসমুজ্জ্বল মুখনিঃসৃত গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে এই বাণী শুনেছেন তাঁরাই অনুভব করতে

পারবেন যে, আমার শিশুপ্রাণে সেই বাণী কি গভীর শ্রদ্ধার বেদনা জাগিয়ে তুলেছিল। আজো আমার কানে যেন সেই স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আজো যেন শুনতে পাচ্ছি—"হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমারা শ্রবণ কর।" সেদিন আমি আর কোনো কথা শুনি নি, শুনলেও মন দেই নি, শুধু এই কথাটিই শুনেছিলাম, এই কথাটিই বুঝেছিলাম—আমরা যে অমৃতের সন্তান। তাঁকে মহর্ষি কেন বলা হয়, তার অল্প একটু আভাস সেই-দিনই পেলাম, কিন্তু ভাল করে বুঝলাম সেই-দিন, যেদিন তাঁর আত্ম-জীবনীখানা পাঠ কর্‌লাম। ভক্ত-হৃদয়-নদী অমৃতসাগরের দিকে গতির পথে, বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদনায়, মিলনের পথের অন্তরায় যা-কিছু সে সমস্ত ঠেলে ফেলে, সরিয়ে রেখে কেমন করে চির ঈপ্সিতকে লাভ করে শান্তিলাভ কর্‌লে, কেমন করে তাঁকে দিয়েই নিজের সকল জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেল্লে, তা যখন পাঠ কর্‌লাম তখন অন্তর আমার শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। ১৮ বৎসর বয়সে শ্মশানে যাঁর বৈরাগ্যভাবের সূচনা হয়,—যে ভাবকে উদ্দীপিত করে তুল্‌ল পরম-পিতার আশীর্ব্বাদবাণীর মতই ঝরে-পড়া ভেসে-আসা একখণ্ড কাগজ, যে-ভাবের পূর্ণতা এবং পরিসমাপ্তি-প্রাপ্তি হয়ে গেল ঋষিকৃত এবং স্বহৃদয়ব্যক্ত উপনিষদ-পাঠে—এবং ২৮ বৎসর বয়সে যিনি আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ এবং বিরাগ সমস্তই উপেক্ষা করে বিষয়-সুখকে জলাঞ্জলি দিলেন, সেই ত্যাগী ভোগ-লিপ্সাহীন পরব্রহ্মে যোজিত-চিত্ত, আনন্দরসে মগ্ন পুরুষকে প্রাণ আপনি মহর্ষি বলে স্বীকার কর্‌লে, তাঁর মহত্বের নিকট আপনার শির নত কর্‌লে।

ভারতের তপোবনে তপোবনে যে-সুর বেজে উঠ্‌ত, সেই সুর যিনি তার গৃহে-গৃহে সংস্থাপনের চেষ্টা কর্‌লেন, যিনি বেদবেদান্তের ভাষায় সঙ্গীদের ডেকে বল্লেন,—যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে এবং মানবের আত্মায় আত্মায় বিরাজ করিতেছেন, হে জিজ্ঞাসু তাঁহাকেই জানিতে চাহ; হে সাধনোৎসুক, তাঁহারই ভজনা কর; মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইবার, অমরত্ব লাভ করিবার ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় পথ নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তাঁকে যে লোকে মহর্ষি বল্‌বে এতে বিস্ময় বা সন্দেহ প্রকাশ করবার আর কিছু রৈল না।

সেই একদিন তাঁর কাছে এসেছিল, যেদিন অন্তরতম প্রাণের প্রাণ যিনি প্রিয়তম সেই পরম-দেবতাকে দেখ্‌বার জন্য তাঁর প্রাণে বিষম ব্যাকুলতা এসেছিল। তিনি তাঁর তৃপ্তিসাধনের জন্য বেদ উপনিষদ কত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, জ্ঞানে তাঁকে জান্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে এল ফিরে।" তখন নিজের হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিজের আত্মার মধ্যে—হিরণ্ময় কোষে বিরাজ কর্‌ছেন! অমনি বিশ্বজগৎ তাঁর সত্তায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, আকাশ পৃথিবী গ্রহনক্ষত্রে স্বপ্রকাশ প্রকাশ পেলেন। মুগ্ধ পুলকিত ভক্ত-হৃদয় স্তোত্র পেয়ে উঠ্‌ল;—

"নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়। নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।" কিন্তু এমনো দিন তাঁর গিয়েছে যখন তিনি প্রিয়তমের দেখা পান নি, যখন চিরসুহৃদ, হৃদয়-সখা তাঁর কাছে ধরা দেন নি, যখন চিত্ত তাঁর সেই অদর্শন-ব্যথায় কাতর হয়ে যুগ-যুগান্তের, সকল দেশের সকল কালের বিরহীর মত কেঁদে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে বলেছিল,—"তুমি যদি দেখা না দাও তবে আমি আর বাঁচ্‌বো না। ওগো, আমি ধন জন মান কিছুই চাই না, শুধু তোমাকেই চাই। তুমি সব নেও, আর সব নিয়ে কেবল তোমাকেই আমায় দাও।" ঐ: ব্যথার দহনে তাঁর সমস্ত দেহ মন জ্বলে উঠ্‌ল,

তিনি কোথাও শান্তি পেলেন না, ছটফট করে দশদিকে হৃদয়-দেবতাকে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তাঁকে তিনি পাচ্ছেন না, তাই তাঁর চোখে বিশ্বভুবন ম্লান হয়ে উঠল। বিরহ-গীতি তো আমাদের দেশে কত যুগ থেকে গীত হয়ে আসছে; মহাকবি ক্ষুদ্রকবি সকল কণ্ঠেই এই করুণ সুর বেজে উঠ্‌ছে, কিন্তু তবু এই বিরহের করুণ সুর আমাদের চিত্তকে অধীর করে তোলে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, লোচনদাস প্রভৃতি কত মূর্ত্তিতেই বিরহ জেগে উঠেছে, কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি হৃদয়ে শুধু বেদনা সঞ্চার করে তোলে, এমন করে অবাক বিস্ময়-বিমূঢ় করে তোলে না, যেমন এই বিরহ করে তোলে। এ কি গভীর, এ কি দারুণ বিরহ, যার ব্যথায় মানুষ রোদকেও কালো দেখে! শিশুর হাসির মত, তরল সোনার মত যে রোদ গলে ঝরে পড়্‌ছে, তা তাঁর চোখে ঠেকল ভাঙা দোয়াত-ওল্টানো কালীর ধারার মত। অমানিশার নিকষকালো অন্ধকারেও বোধ হয় মানুষের এমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে না। এত বেদনায়, এত কাতরতায় রাজাধিরাজের আসন টলালো। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু করুণা-নিলয় ভগবান ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন, তাঁর সব নিয়ে আপনাকে ধরা দিলেন। ঐশ্বর্য্য গেল, বন্ধু গেল, তাতে ক্ষতি কি? ভক্তহৃদয় সে পরিপূর্ণানন্দের সঙ্গ-লাভে মাতোয়ারা—নন্দতি নন্দতি, নন্দত্যেব।

শুনেছি এ সম্বন্ধে একদিন তাঁর কোনো গুরুজন তাঁকে ঈশ্বর যে আছেন তা প্রমাণ করে দিতে বল্লেন, তাকে তিনি একটি দেয়াল দেখিয়ে উত্তর করেন, এই দেয়ালটা যে আছে তা প্রমাণ করে দিন তো। সেই গুরু ব্যক্তিটি তখন বল্লেন, এর আবার কি প্রমাণ দেবো, এ তো চোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি যে আছে। দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করলেন, "ঈশ্বর যে আছেন তারি বা আর কি প্রমাণ দেবো, আমি যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি তিনি আছেন।" কি বাস্তব ঈশ্বরদর্শন তাঁর! এই দেখেই তো বলতে ইচ্ছা হয় যে, হায় আমরা! যে-দেশের লোক মৃণ্ময়ী প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ীর রূপ দেখ্‌তে পায়, সেই দেশের লোক আমরা বিশ্বজগতে তাঁর বিকাশ দেখ্‌তে পাই না। তাঁরি মধুর রূপে যে ভুবন ভরে আছে, তাঁরি সৌন্দর্য্যভাতি যে দিকে দিকে ফুটে উঠেছে—তাই যে সব এত সুন্দর! ওরে মন, তোমার সকল জগৎ তাঁকে দিয়েই আচ্ছন্ন কর, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যে তোমার আপন কণ্ঠে, তোমার আপন হৃদয়ই যে তোমার বেদ-বেদান্ত, তোমার কোরাণ-বাইবেল; তুমি যে নিজেই বিশ্বদেবতার মন্দিরের পুরোহিত, তাঁর পূজার ভার যে তোমার হস্তে ন্যস্ত আছে। হায়, অন্ধ, চোখ খুলে দেখ্‌তে জান না! হায় বাক্যহারা, তুমি পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করতে শেখ নি, তাই বিশ্বজগতে যে তাঁর পূর্ণতা দেখ্‌তে পাও না! তাই অবিশ্বাস, তাই সন্দেহকে মনে স্থান দাও। আজ শেখ, কেমন করে চোখ পেতে হয়, গলার সুর কেমন করে আপনি বেজে ওঠে।

দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য ছিল না। তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও নির্লিপ্ত ছিলেন। পুরাকালের রাজর্ষি জনকের মত একালের রাজর্ষি। তাঁর পথপ্রদর্শক ও নেতা রাম-মোহনের মত সংসারকে আশ্রয় করেই তিনি সেই সংসারাতীত পরম পুরুষের সাধনা করে-ছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাকে ছিঁড়ে ফেলে, হৃদয়ের যেসকল স্বাভাবিক সামাজিক বৃত্তি তাদের গলা টিপে মেরে ফেলে যে ধর্ম্মসাধন, তাতে যেন মনুষ্যত্বের হানি হয়, তাতে যেন স্বার্থপরতার গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর প্রাণের কাছে তাঁর গৃহকে যে তিনি একটা জড় হয়ে উঠতে দেন নি সেটা তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে অন্তরায়-স্বরূপ হয়ে উঠবে, বা তার

মানব-সেবা ও ঈশ্বর-প্রীতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সর্ব্বদা বিলাস-বৈভবের মধ্যে, সংসার-বুদ্ধির কূটতর্কের মধ্যে থাক্‌লে সেই পরম পুরুষের সঙ্গে নিত্যযোগের ব্যাঘাত জন্মাতে পারে, সেইজন্য তিনি নির্জ্জনে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্য হিমালয় প্রদেশে অনেক সময় কাটাতেন। পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে, তার বিরাট গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একাকী আপনার হৃদয়-দেবতার ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাক্‌তেন।

এই হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাই। একদিকে তাঁর প্রাণ তারি উচ্চ তুষারধবল শৃঙ্গের মত শুভ্র পবিত্র; পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর কত ঊর্দ্ধে, অসীমের বুকে আপনার মাথাটি রেখে পরম আনন্দে তাঁরি চিন্তায় নীরবে মগ্ন; আবার অন্যদিকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রেখে তারই উপপর্ব্বতগুলির মতই আশ্রয়দাতা পিতা প্রতিপালকরূপে স্নেহে শ্যামল! অন্দরের আনন্দ ও প্রেম যেন তারি কলনাদী নির্ঝরগুলির মত জীবনদায়ক রসে গলে ঝরে পড়ছে।

তাঁর পুত্র বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবন-স্মৃতিতে অল্প কয়েকটি রেখাসম্পাতে পিতৃদেবের যে-ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবী তার পিতৃ-স্মৃতিতে যে-কথা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে আমরা তাঁদের আকাশ থেকেও উচ্চ যে পিতা সেই পিতারই স্নেহময় মূর্ত্তি প্রকটিত দেখি। পুত্র-কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাঁর স্নেহ তিনি সন্তানগণের মধ্যে বেঁটে দিয়েছিলেন।

তিনি একদিকে যেমন কুসুমকোমল, অপর দিকে তেমনই বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন। সকল কাজে, সকল বিষয়ে একটা নিয়ম নিজে মেনে অপরকে মানিয়ে চলতেন। এই নিয়ম একটা প্রাচীর মত জীবনকে আবেষ্টন করে থাকত, তার মধ্যে কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা; তার বাইরে যাবার যো নেই। এখানেই—তাঁর বাড়ীর মধ্যে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন ঋষি-তপোবনের গন্ধ পাই। সেই তপোবন-শিশুর, অবাধ মুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে যে সংযম-শিক্ষা, তাহাই সেই আশ্রমস্বামীর আদেশ-প্রতিপালন।

পূজ্যপাদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নাতি-নাৎনী-পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি অল্পবয়স্ক শিশু বড় চঞ্চলতা প্রকাশ করছিল। তিনি তাকে স্থির হতে বলা সত্ত্বেও সে স্থির হতে পারল না, তখন তিনি তাকে তার পূর্ব্বস্থান চ্যুত করে অন্য যায়গায় দাঁড় করালেন, সেখানে সে অল্পক্ষণ চুপ করে থেকেই আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করল, তিনি তাকে তুলে আবার তার পূর্ব্বস্থানে দাঁড় করালেন, এরকম দুই তিন বার করার পর শিশুটি শান্ত হয়ে দাঁড়ালো। এমনি করেই তাঁর শিক্ষাদান চলত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা যেমন চিন্ময় স্বরূপের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, আমাদের এই কালের মহর্ষিকেও আমরা সেইরকম স্তিমিত-লোচন ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তিতেই দেখ্‌তে পাই। ধ্যানের ভাবই তাঁর মধ্যে আমরা বেশী বিকশিত দেখ্‌তে পাই। প্রিয়তমের সান্নিধ্য অনুভব করতে, তাঁর রূপ ধ্যান করতে, তাঁর গুণগান করতেই তিনি ভাল বাস্‌তেন। কাঙালের মত 'আমায় এ দাও, তা দাও' করে তাঁর কাছে কান্না-কাটি করার ভাব তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে নি। তাকে কাঁদতে দেখি তখন, যখন অন্তরতম চিত্তরঞ্জনের অভাবে বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে একেবারে অন্ধকার; যখন প্রাণ বিরহব্যথায় আকুল হয়ে মরে যেতে চাচ্ছে। তারপর আমরা আর একবার তাঁকে বিশ্বদেবতার দুয়ারে ভিখারীর বেশে দাঁড়াতে দেখি, যখন তিনি তাঁর নিকটে দিব্যজ্ঞান

শুদ্ধপ্রীতি ভিক্ষা করছেন। সেখানেও মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গলময় মূর্ত্তিই তাঁর নিকট প্রকটিত হয়ে উঠল। তিনি বল্লেন—

দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি—
তুমি মঙ্গল আলয় তুমি মঙ্গল-আলয় ;
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদে আশ্রয়।

—কি সুন্দর এ প্রার্থনা ! কি গভীর কি মহান্ !

আত্মা তাঁর পরমাত্মার মধ্যে মিশে গিয়েছে। যাঁর সঙ্গে এ-জীবনে নমস্কার-পূর্ব্বক নিত্যযুক্ত থাকতেন, জীবনের পরপারে সেই প্রাণের প্রাণ যিনি তাঁরি কোলে তিনি নিত্য আনন্দে বিহার করছেন। কিন্তু তাঁর বাণী আজো আমাদের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। সে-বাণী নিত্যকাল জাগ্রত থাকুক। তাঁর প্রসন্ন নেত্রের স্নেহদৃষ্টি আজ আমাদের উপর পতিত হোক, আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করুক, আমাদিগকে নিজ অধিকার লাভে প্রয়াসী করুক। আমাদের কুল পবিত্র হোক। জননী কৃতার্থা হউন।

হে পূর্ব্বগত, হে বরণীয় পথ প্রদর্শক, আজো আবার তোমার বাণী শুনাও, আজো আবার গভীর কণ্ঠে আমাদের বল—আমরা যে ভুলে যাই—তাই বল 'ভুল না চিরসুহৃদে !' অন্তরতমের নৈকট্য প্রাণে অনুভব করতে পারছি না ; দিন যে আমাদের এমনি করেই কেটে যাচ্ছে, প্রাণ তো কৈ তাঁর অদর্শন-ব্যথায় ধূলায় লুটিয়ে কেঁদে বলছে না, ওগো তুমি কাছে নাই, তাই আমি আর বাঁচি না ; হৃদয় আমাদের অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন, তাই হে স্নেহময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রাচীর-ভালে অরুণ লেখা কবে দেখব সেই আশায় পূর্ব্বাকাশের দিকে ঊর্দ্ধমুখে করপুটে চেয়ে থাকি। আলো যে চাই, আলো যে চাই। অমৃতের সন্তান আমরা অমৃতধামের দিকে আনন্দ গান গেয়ে যে চলে যান। অমৃতময়ের আশীষ-ধারার সঙ্গে তাই তোমার আশীর্ব্বাদও আজ আমাদের মাথায় ঝরে পড়ুক। আমরা আপন অধিকার চিনে নি এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী হই।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

লোকান্তর

কোন্ লোকে চলি গেলে তুমি,
কিরূপ সে লোকান্তর-ভূমি,
সুখ কিম্বা দুঃখময় জানিতে বাসনা হয়
কেমন সে নূতন ভুবন,
প্রিয় বা অপ্রিয় নিকেতন ?

হাসে সেথা বিমল প্রভাত,
ফোটে ফুল হয় দিন-রাত,
আছে সেথা কর্ম্মভূমি ! —তথায় কি কর তুমি,
কর কর্ম্ম লভ কি বিরাম,
হের দৃশ্য নয়নাভিরাম ?

শুনাও কি শ্রবণে তব
পরাণ-জুড়ানো সঙ্গীত-রব ?
তাঁহাদের সাধুবাদে সাধ কি গো মনোসাধে
সুধাময় পরম মধুর
ত্রিদিবের তান লয় সুর ?

পাঠ তব প্রিয়তম ধন,
করেছ কি সেথা সমাপন,
কোথা কার কাছে শিখ, মনোভাব কিসে লিখ,
কর কি গো আদান-প্রদান,
উচ্চ চিন্তা উন্নত বিজ্ঞান ?

কিম্বা সেথা হেথাকার মত
নাহি হাসে গ্রহ-তারা যত,
ফোটে না কো ফুলরাশি, নাহি গান নাহি হাসি,
নাহি সেথা নিয়ম-গঠন,
লোকান্তর কে জানে কেমন ?

যেমনি যে লোক সৃষ্ট তুমি,
তাই লয়ে সুখে থাক তুমি,
তাহারি মনের মত গড়িতে আপন চিত
রূপ রসে ভরিতে আপনা,
কর তুমি মহতী সাধনা।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

সংবাদ

১। মার্চ মাস হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার হারবার্ট স্টেফেন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

২। কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ক্রাঙ্গানোর গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ে কতিপয় অস্পৃশ্য টিয়া জাতীয় বালিকা ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করে, তাহাতে তথাকার ব্রাহ্মণ ও নায়ারগণ বলেন, বিদ্যালয় হইতে দেবমন্দির বহুদূরে নয়, টিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলে দেবমন্দির ও দেবতা অপবিত্র হইবে। অতএব টিয়া বালিকা ভর্ত্তি করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কোচিন রাজ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পন্থা অতি সুন্দর।

৩। সম্প্রতি লণ্ডন নগরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" অভিনীত হওয়ায় তথায় তাঁহার খ্যাতি সকলের মনে আবার নবীন হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীতে সম্মানিত হইতেছেন, বাঙ্গালী মাত্রেই ইহাতে গৌরব অনুভব করিয়া থাকে।

৪। জার্ম্মাণিতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় তুলার একান্ত অভাব হইয়াছে, এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, সেইজন্য জার্ম্মাণ সামরিক হাসপাতাল-সমূহে শৈবালের ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হইতেছে। তথাকার চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন শৈবালের রক্তস্রাব বন্ধ ও ক্ষত আরোগ্যের শক্তি আছে। শৈবালের গুণ ইউরোপের লোক জানিতে পারিয়া অনেকেই উহার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

৫। আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, নববিধান সমাজের সঙ্গীতাচার্য্য ভক্তিভাজন প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় গত ২০শে মাঘ প্রাতে ১০টা ১৫ মিনিটের সময় দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় বৎসরাবধি শয্যাগত হইয়াছিলেন, শেষ অবস্থায় বাক্‌রোধ হইয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছিলেন। ভগবান তাঁহার ভক্ত সন্তানকে শান্তি-ক্রোড়ে স্থান দিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে পরিচিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যেসকল মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ইহলোকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

৬। সম্প্রতি রুমানিয়ার বর্ত্তমান রাজমাতা, পরলোকগত রাজা চার্লসের পত্নী রাণী এলিজাবেথ (কারমেন সিলভা) পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি একজন কবি ছিলেন। "কারমেন সিলভা" নাম দিয়া ইঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। ইনি নানা গুণে গুণবতী ছিলেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No 632

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩২ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২২। এপ্রেল, ১৯১৬। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

নিবেদন।

(১)

শিশির-সিক্ত শ্যামল পত্র, তরুণ-অরুণ-রাগে
ঝলকিলে যবে পুলকে উলসি' বিহগের গীতি জাগে,
নিত্য নবীন মাধুরী ফুটিয়া কুসুমে লুটিয়া হাসে,
তখন যেন গো তোমারি বদন দেখি গো প্রভাত-বাসে।

(২)

দীপ্ত-দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, নয়ন যখন বাঁধে,
কর্ম্ম-ভূমির তপ্ত শিলায় ক্লান্ত যখন কাঁদে,
তখন যেন গো তোমার শীতল করুণা-সাগর তীরে,
লভি গো তোমার শান্তি-সমীর বক্ষে, ললাটে, শিরে।

(৩)

সান্ধ্য ছায়ার মণ্ডপ-তলে সঞ্চরে যবে রাতি,
শ্রান্তি হরিতে সে ছায়া-প্রান্তে আসন যখন পাতি,
তখন যেন গো তোমার অভয়-পরশ জড়ায়ে দেহে
নবীন শক্তি লভিতে ঘুমাই আমার আঁধার গেহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমাদের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

খাবার খাইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল। আমরা আবার বসিলাম। তিনি বলিলেন, "আমায় বুঝাও।" মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আমি তোমায় বুঝাব! আমি কে! আমি কতটুকু! তুমিই এ পামরীর অন্ধ চক্ষে জ্ঞানের আলো দিয়েছ,—তুমি আমার কাছে বুঝ্‌তে চাও! আমি কি বুঝ্‌তে পারি নে, তুমি আমায় পরীক্ষা কর? আমি তোমায় বুঝাব? তুমি সত্য, আমি মায়া; তুমি বস্তু, আমি ছায়া; তুমি গুণ, আমি কায়া;—আমি তোমায় কি বুঝাব নাথ! আমায় নিয়ে এমনি করে' রঙ্গ করে, এমনি করে নেড়ে চেড়ে তোমার তৃপ্তি হয়! তাতে আমার কত সুখ! পরীক্ষা দেবো বৈকি।"

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "বল সরোজিনী,—আমি তো বুঝ্‌তে পারি নে, নারী-হৃদয় কেমন করে এমন অবস্থায় আত্মার উন্নতি কর্‌তে সক্ষম হবে?"

আ। এমন অবস্থায় পড়লে নারী যদি অশিক্ষিতা, অন্ধসংস্কারাপন্না হয়, এবং ক্ষণজন্মা ও সুলক্ষণা হয়, তবে স্বামী যতই মন্দ হোক, যতই অসুন্দর হোক, যতই পিশাচ-বৃত্তি হোক,—সে শুধু সংস্কার-বশে সেই স্বামীতে আন্তরিক ভক্তি রাখতে পারবে। স্বামীর অসদ্ব্যবহার নীরবে সহ্য কর্‌বে এবং সতত সেই স্বামীর সন্তোষবিধানে সাধ্যমত তৎপর থাক্‌বে। এ ক্ষেত্রে তা'র ভক্তি—অন্ধ-ভক্তি—নিকৃষ্ট ভক্তি; কিন্তু ফল একই—মুক্তি, অর্থাৎ, আত্মার বিশুদ্ধতা-হেতু জন্মান্তরে পুরস্কারলাভ, সৌভাগ্যলাভ, এবং এজন্মে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার—মনের শান্তি। তার কাছে আর কি আছে! দ্বিতীয় স্তরের নারী অর্থাৎ অর্দ্ধশিক্ষিতা নারী নিশ্চয়ই এখানে রণে ভঙ্গ দেবে। তা'র মনে আনবে "ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সতীত্ব ইত্যাদি সবই মানুষের কল্পনা-প্রসূত। কেবল সমাজে শান্তি রাখবার জন্যই কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম রেখেছে, এবং পাছে লোকে পালন না করে, এইজন্য নরকের ভয় ও জন্মান্তরে অসহনীয় দুঃখভোগের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্র বানিয়ে রেখেছে। এসবই রাজনৈতিক চাল—Political expediency. যা'রা লেখাপড়া জানে না তারা কি বোকা!—এই সব ধোকা তারা বিশ্বাস করে, আর গাধার মত কষ্ট ভোগ করে। আমি লেখাপড়া শিখেছি, এসব ব্যাপার তলিয়া বুঝে ফেলেছি,—আমার কাছে চালাকী? বাবার টাকা ছিল না বলে, আর ছাই কুল রক্ষা হয় না বলে, আমার আজ এই দশা! আমি এমন সুন্দর, আমার এমন গড়ন, আমার এমন বুদ্ধি, আমার এমন মিষ্টি কথা—আমার কত রূপ, কত গুণ, মানুষের হাতে পড়লে আমার কত কদর হ'ত। পোড়া কপাল, মিন্‌সের কি মূর্ত্তি—যেন পোড়া বাঁদর! গায়ে কি বিট্‌কেল্ গন্ধ! কি বাক্যি—যেন গায়ে ঝাঁটার বাড়ি দেয়; তার ওপর ঐ গুণের ছিরি!" এইসকল মনের ভাব যেদিন হতে হওয়া, সেইদিন হ'তে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত, সেই মুহূর্ত্ত হ'তে কপালে আগুন;—যে সুবিধে পেল এবং লোক-লজ্জাকেও পদাঘাত করলে, সে কার্য্যতঃ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হ'ল। পাপকে একবার আশ্রয় কর্‌লে, প্রবৃত্তিকে একবার

আশ্রয় দিলে—তার পরিণাম কোথায় কে বলবে ? —Who knows where sin terminates ? আবার কেহ হয় তো সুযোগ অভাবে অথবা লোকলজ্জার খাতিরে কার্য্যক্ষেত্রে নামল না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধা রইল। এরা মনের ভাল—কিন্তু প্রভেদ অল্পই।

দ। পুরুষের বেলা যা-ইচ্ছে করলে শোভা পাবে ?—আত্মা ধোয়া-পোঁছা থাকবে ?

আ। তাঁরা তো আর সৃষ্টিকর্ত্তার আদুরে ছেলে ন'ন্। কিন্তু তাঁদের পাপের ভোগ তাঁরা ভোগ করবেন, সে কথায় আমাদের কাজ কি ? তুমি নেমকহারাম বলে আমি কেন তোমার দান করব না ? কেন তোমার উপকার করব না ? তোমার অকৃতজ্ঞতার ফলে তোমার আত্মা কলুষিত হইবে। আমার দানের, পরোপকারের পুরস্কার আমি অবশ্যই পাব—আত্মপ্রসাদ লাভ করিব, আত্মা পবিত্রতা লাভ করবে।

দত্ত। কিন্তু শিক্ষিতা নারীর হৃদয়ে কি ভাব আসবে ? কি জ্ঞান তাঁকে সৎপথে রাখবার সাহায্য করবে ? দাঁতকাটাকে নিয়ে সে কি করবে ?

আ। প্রথমতঃ শিক্ষিতা নারীকে স্বামী নিয়ে কষ্টে পড়তেই হয় না। যাঁর বুদ্ধি নেই সে কখনো উচ্চ শিক্ষা পেতেই পারে না—অতএব সুশিক্ষিতা নারী অবশ্যই বুদ্ধিমতী। যে শাকান্নও এমন করে পাক করতে জানে, যা খেতে নিশ্চয়ই মুখরোচক হবে; যে পূর্ণকুটীরও এমন সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত রাখতে জানে, যাতে অট্টালিকাবাসীও বাস করে শান্তিলাভ করতে পারে। বুঝিলে ? এখন উক্তপ্রকার স্বামীর গুণকে শাকান্ন মনে কর, এবং রূপকে পর্ণকুটীর মনে কর—তা' হলেই সব বুঝতে পারবে। এ পৃথিবীতে আজো এমন পুরুষ-মানুষ কেউ জন্মায় নি, যে স্ত্রী-লোকের সৌজন্যে বশ না হয়। স্বামী যতই মন্দ হোক, এই স্ত্রীর হাতে পড়লে তাকে নিশ্চয়ই সোজা হতে হবে—নইলে কিসের শিক্ষা ? শিক্ষিতা নারী যদি সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্যাদিকে আপনার আয়ত্তে এনে, তাকেই সুখের স্বরূপ করতে না পারল, তবে তার কিসের শিক্ষা ? শুধু বই পড়লেই শিক্ষা হয় না। বই না পড়েও আমাদের সমাজে এক একটি নারী আজো যে-জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় দিয়া থাকেন, তার কাছে কোথায় তোমার বই ? শিক্ষা মানেই বুদ্ধির উন্নতি।

দ। কিন্তু এমন করে থাকতে তার প্রবৃত্তিই বা কেন হবে ? অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীর যে মনোভাব আসবে, এর তা কেন আসবে না ? —এবং কেন সে কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত হবে ? কি গরজ পড়েছে ?

আ। যেহেতু শিক্ষিত স্ত্রীলোক বোঝেন যে, অনন্তকাল ধরে আমাদের জীবাত্মা আপনার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করতে করতে, কোটি-কোটি জন্মপরিগ্রহ করে, কোটি কোটি দেহ ধারণ ক'রে অনন্তের পথে চলেছে,—চরম উদ্দেশ্য মুক্তি, ব্রহ্মে লীন, সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া। তিনি বোঝেন, তাঁর বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ কতক পরিমাণে পূর্ব্ব-জন্মেরই কর্ম্মের ফল। তিনি বোঝেন, এই অনন্ত কালের কাছে আমার এই অনন্ত ভ্রমণের কাছে, এইজন্মের পান্থ-নিবাসের অবস্থিতি কতটুকু ? আমার এ জীবন কতটুকু ?—বড় জোর এক শত বৎসর ; তার মধ্যে আমার যৌবন কতটুকু ?—বিশ বৎসর, বড় জোর ত্রিশ বৎসর। অনন্ত কালের কাছে, অনন্ত ভ্রমণের কাছে তাহা কতদিন ? য়ুরোপ আজো তা বোঝে নি, আমরা অনেক দিন বুঝেছি। যদি বুঝেছি, তবে প্রবৃত্তির ভ্রূভঙ্গীতে কেন বিচলিত হই ? তখন তিনি তাঁর জ্ঞানের আলোকে দেখতে পান, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলে আমায় এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে,—সামান্য পরীক্ষা, এই জন্মের এই কয়টি দিনের পরীক্ষা

মাত্র। এখন যদি উত্তীর্ণ হতে না পারি, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে ফেলি, তবে সব মাটি ;—গু'টি এতদূর তুলেছি, এখন একটি দানের দোষে সে গুটি আবার কাঁচবে! এই কিস্তির বেলা বুঝে চা'ল দিতে না পারলেই অশ্ব-চক্র ঘুরবে, এইবার ছক্কুড়ি-সাতের খেলা রাখতে না পারলেই আমার এত কষ্টের চার-খানি কাগজ একবারে উঠে যাবে!

দ। তুমি তবে জন্মান্তর মানো? ভাগ্যও মানো?

অ। অবশ্যই জন্মান্তর মানি,—জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে তোমার চরণে কেমন করে আশ্রয় পেলুম?

দ। সে কথাটি বরং আমারই বেলা খাটে। কিন্তু এ সব কথা ছেড়ে, অন্য কি দেখে তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস কর?

অ। এইসব থিওজফির গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রিকাগুলি তুমি যতই আমায় পড়ে শোনাও, ততই আমি দেখ্‌তে পাই, আমাদের জন্মান্তরবাদ অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। আর মানুষের কর-রেখা দেখে আমরা তা'র জীবনের অনেক কথা যখন বল্‌তে পারি, তখন নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে, জন্মান্তর আছে;—তারই কর্ম্মফলের নক্‌সা হাতে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি। হিন্দুর জন্মান্তরবাদের এবং কর্ম্মফলবাদের এমন সোজা প্রমাণ আর কোথায়?

দ। যদি ভাগ্যই সব করায়, তবে পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব আর কোথায় থাকে? পুরুষকারই বা ফলকে পান কৈ?

অ। পাপ-পুণ্য অবশ্যই আছে। ভাগ্য মানে কি? আমার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম ফল। কিন্তু এ-জন্মে পুরুষকার-দ্বারা আমি ভাগ্য অনেকটা পরিবর্ত্তন করে ফেলতে পারি—modify করতে পারি। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলে আমার এ জন্মে মাসে একশত টাকা প্রাপ্য, কিন্তু এ জন্মের চেষ্টা ও পুরুষকারের গুণে আমি তা বৃদ্ধি করতেও পারি, আবার কর্ম্ম-দোষে তা কমাতেও পারি। দুইই সত্য—ভাগ্যও সত্য, পুরুষকারও সত্য—fate ও সত্য, freewillও সত্য। পুরুষকারের দ্বারাই তো ভাগ্য সৃষ্টি হয়েছে। কর্ম্মদ্বারাই তো কর্ম্ম-ফল নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠাণ্ডা লাগানো-রূপ কর্ম্মের ফলে জ্বর হ'ল; এখন কুইনাইন-খাওয়া-রূপ কর্ম্মের দ্বারা তা খণ্ডন করতে পারি, অথবা তেঁতুল খাওয়া-রূপ কর্ম্মের দ্বারা জ্বর-রূপ ফলের পুষ্টিও করতে পারি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে অর্থাৎ চেষ্টার ফলে যতটুকু বিদ্যে এ জন্মে পাওনা, এ জন্মের কর্ম্ম-গুণে তা বাড়াতেও পারি, কমাতেও পারি। সকলের মূল—চেষ্টা। এই চেষ্টা-দ্বারাই জগৎ বিকাশমান;—আমরা তার আগে চলেছি, ইতর-জীব ও উদ্ভিদাদি পেছনে আসছে। এই চেষ্টা মানে প্রবৃত্তি— কু অথবা সু। যার ফলে দুঃখ তাই 'কু' অর্থাৎ পাপ, আর যার ফলে সুখ তাই 'সু' অর্থাৎ পুণ্য,—সোজা কথা। কিসে সু, কিসে কু ঠেকে শিখতে হবে—কেউ বলে দেবে না। পাঁচ বছরের শিশুকে অগ্নি ক্ষমা করে হাত পুড়িয়ে দিতে বিরত থাকবে না, অতএব সর্ব্বদাই নজরটা উঁচু রাখা উচিত,—বড় হব, ভাল হব, সুন্দর হইব, জ্ঞানী হইব, বীর হইব ইত্যাদি। সৎপথে থেকে এজন্মে যতদূর পারব,—উঠব, মরবার সময় সেই উঁচু নজর সঙ্গে নিয়ে যাব,—জন্মান্তর গ্রহণের সময় আমার সেই বিশুদ্ধ নজরই আমায় বাঞ্ছিত স্থানে নিয়ে যাবে। সুখী হবার চেষ্টা একবিন্দুও ছাড়া উচিত নয়। অভিমান ক'রে ভাল মানুষের মত দুঃখ সহ্য করলে, কখনো দুঃখ যাবে না—অভিমান শোন্‌বার এ দুনিয়ায় কেহ নাই।

দত্ত। অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার সুখ খুঁজিব, এতেই মঙ্গল হবে!

আ। অবশ্য, কিন্তু যেন-তেন-প্রকারেণ নহে। সৎপথ ব্যতীত সুখের রাজ্যে পৌছবার অন্য পথ নেই। প্রবৃত্তি প্রলোভন দেখাবে, কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে—সেইটে সামলাতে হবে।

দ। তবে যদি ব্যভিচারে সুখ হয়, তবে কেন তা না করবে?

আ। করুক ব্যভিচার। কিন্তু ব্যভিচারে যে আত্মার অধোগতি হয়, তা কোনো বুদ্ধিমান লোককেই বুঝাতে হবে না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয়েই আত্মার ক্রমোন্নতি হয়;—ব্যভিচার করলে গণ্ডীর বার হওয়া হল, কেবল প্রবৃত্তিতেই আত্মসমর্পণ করা হল,—তা হলেই সর্ব্বনাশ। সে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার ঠিকানা নেই।

দ। রামপ্রসাদ বলেন, কেবল নিবৃত্তিকেই আশ্রয় কর।

আ। ভুল এবং অসম্ভব। রামপ্রসাদ নিজে সিদ্ধ ছিলেন তাই সবাইকেই সিদ্ধ মনে করতেন। আম পাকলে বোঁটা আপনিই খসে আসে। অর্থাৎ যতদিন কাঁচা থাকে, ততদিন রস সংগ্রহ করতে থাকে, পুষ্ট হতে থাকে;—যেই ডাঁশা হয়, অমনি রসটানা বন্ধ হয়—নিবৃত্তি উঁকি মারে। কিছুদিন পরেই পেকে আপনিই খসে পড়ে,—মুক্তি হয়। তাঁর পূর্ব্বজন্মে বাসনার উচিত মত পরিতৃপ্তি হয়েছিল বলে, বাসনা আর ছিল না—তাঁর আম রং ধরেছিল। কিন্তু সকলের তা নয়—বাসনা আছে। ক্রমে ক্রমে কতজন্মে তার পরিতৃপ্তি হবে, এবং অবসাদ এসে নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দেবে। প্রথমে কেবল প্রবৃত্তি—যেমন উদ্ভিদ, পশু এবং অনুন্নত মনুষ্য। পরে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—যেমন সাধারণ মনুষ্য। তারপর নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ—যেমন সিদ্ধপুরুষ, মুক্তাত্মা। সাধারণ মানুষ কি একদম্ নিবৃত্তিকে আশ্রয় করতে পারে? সাধ্য কি? কাঁচা আম টেনে ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতলে, তার আঁটিতে চারা হয় কি? না পেলেই কি বাসনা যায়? শেয়াল যেমন রাগ করে বলেছিল, "আঙ্গুর ফল বড় টক্"।

দত্ত। তবে যে বাল-বিধবাদের জোর ক'রে আমরা সন্ন্যাসিনী সাজাতে যাই—মহাপাপ করি নে কি? আমি মানলুম যে, একদম্ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দিলে নিশ্চয়ই সে আমায় নিয়ে গিয়ে কালাপানিতে ফেলবে—তখন ফেরা মুস্কিল। এজন্য ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তির সাঁতার শিখে উজান চলতে শিক্ষা ক'রে, ক্রমে জোর বাড়ানো স্বাভাবিক নয় কি? অতএব একটু মিশিয়ে, প্রবৃত্তির দাবীও একটু স্বীকার করে, চললে, ঠিক ঈশ্বরের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করা হয় না কি? দেখ, প্রকৃতি সর্ব্বদাই সন্তান ধারণ করতে, সন্তান প্রসব করতে নিযুক্ত—প্রকৃতির অহরহ চেষ্টাই বীজ-ধারণ। আদি-পুরুষ প্রকৃতির মধ্য দিয়েই বিকাশ পাচ্ছেন। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখতে পাবে, ফুলের গাছে যে-সকল সুন্দর সুগন্ধ ফুল ফুটেছে, তা তোমার খোঁপায় গুঁজবার জন্য নয়, এবং যে-মধু রয়েছে, তাও তর্করত্ন মশায়ের মকরধ্বজ মেড়ে খাবার জন্য নয়,—সন্তান প্রাপ্ত হবার জন্য। গাছের চেষ্টায় ক্রমশঃ সে তার পাতাকেই ফুল করে নিয়েছে, এবং তাতে সুমিষ্ট মধু ও সুগন্ধ রেখে দিয়েছে; ভ্রমর সেই লোভে তাদের মধ্যে যাওয়া-আসা করবে—ঘটকালী করবে এবং এই উপায়ে ভ্রমর পাখনা ও পায়ের দ্বারা এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে, তাতেই তাদের বংশরক্ষা হ'বে—অর্থাৎ ফল বা সন্তান হবে। এই ফুল করবার জন্য

অর্থাৎ, সন্তান পাবার জন্য, তাকে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—যুগ-যুগান্তর ধরে বংশ-পরম্পরায় এই চেষ্টা চলেছে, তবে এতটা কাণ্ড করে তুলতে পেরেছে। এই ফুল করবার জন্য তারা নিজেরা বাড়তে পায় না! কি করে, সন্তান তো চাই; যে-সকল উদ্ভিদ ফুলের-জন্য বিখ্যাত নয়, তাদের বংশ রক্ষা-ক্রিয়া সমীরণের ঘটকালীতে, কোথাও বা অন্য উপায়ে সম্পন্ন হয়—তাদের এত কষ্ট পেতে হয় নি, বাড়তেও পায়। অতএব দেখ স্ত্রীলোকের সন্তান হতে না দেওয়া কত বড় মহাপাপ। সন্তান-কামনা ছাড়া যে ইন্দ্রিয়-আলোচনা, তাই প্রবৃত্তি, তাই পাপ, তা' দমন করাই ধর্ম্ম। পশুর নিকট মানুষে এ ধর্ম্ম শিক্ষা করতে পারে। অনেক উদ্ভিদ একবার মাত্র প্রসব করেই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল ব'লে মনে করে; কিন্তু সন্তান একবার চাই-ই; যেমন কলাগাছ ইত্যাদি। সিংহী জীবনে একবার মাত্রই প্রসব করে,—কিন্তু একবার প্রসব চাই ই। কর্কট প্রসব করবার সময়ই মরে যায়—তথাপি সন্তান চাই। এখন দেখ, যে সন্তান না পেয়েছে, তার বিয়ে দিলে কোনো পাপ নেই, বরং না দেওয়া মহাপাপ। সে-স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসী করতে যাওয়া, আর জোর করে "আণ্ডর খাট্টা হ্যায়" বলানো সমান কথা। বন্ধ্যাত্ব অবশ্য পৃথক কথা; তা পীড়া। সমাজে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার-লাভ করলে, স্ত্রীলোকেরা আপনিই সংযত হবেন, —কিন্তু অন্ততঃ একবারও তাঁর সন্তানে দাবী আছে। ইহাই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। যদি কোনো ঋষি ইহা রদ করতে চান, তবে তিনি মহামূর্খ, তাঁর কথা অশ্রদ্ধেয়। সন্তান হওয়ার পর যিনি বিধবা হন,—তাঁর পরে সন্তান যদি মরে যায়,—তবু তাঁর মনকে প্রবোধ দেবার ধর্ম্মসঙ্গত যুক্তি আছে। এই সকল কারণেই আমি সরলার আবার বিয়ে দিতে চাই, তার দিকে আমি যে আর চাইতে পারি নে। সে যে আমার সহোদরা অপেক্ষাও আদরের; সে যে নিরপরাধিনী।

বেলা গিয়াছে খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে, সংসারেরও অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, ছুটী লইয়া চলিলাম।

৬

অন্যদিন সন্ধ্যার পরে পাচিকার সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় থাকি। আজ সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘরে আসিয়া বসিলাম এবং দত্তজাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র ছিলেন। যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব প্রসঙ্গ চলিল। আমি বলিলাম—

কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কেমন ক'রে আসবে?—সতীত্ব-ধর্ম্ম তা হলে লোপ পাবে না কি?

দ। আসক্তিতেই অধর্ম্ম। সন্তানহীনা বিধবা যদি ইন্দ্রিয়াসক্তির বশবর্ত্তী হয়ে পুনর্বিবাহ করেন, তবে সতীত্ব লোপ পেল বৈকি? এমন তো সধবা নারীও যদি মনে-মনে অন্য পুরুষে আসক্তা হন, তবে তিনিও তো সতীত্ব হারালেন। সতীত্ব গাছের ফল নয়, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে এতটা কল্পনা করছিনে,—দুনিয়াটা নেহাত দেবতার হাট-বাজার নয়, সন্তানহীনা বালবিধবা সন্তান-কামনায়ই পুনর্বিবাহ করচেন, ইহাই আমরা কল্পনা করিতে চাই। নইলে "ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়" হয়ে যায়।

আ। এসকল কথা শুনতে বড় ঘৃণা করে।

দত্ত। প্রথমতঃ একটু ভাগ্য মেনে চলা উচিত। সরলার ভাগ্য আর পদ্মমুখীর ভাগ্য কি সমান?

আ। ও ছুঁড়ীর নাম আমার সাম্‌নে কোরো না।

দ। ছি সরোজিনি! যতদিন তোমায় বিবাহ করেছি, কেবল এই একটিমাত্র দুর্ব্বলতা তোমার চরিত্রে লক্ষ্য করে আসছি,—চাঁদের বুঝি

কলঙ্ক অনিবার্য্য? অবশ্য তোমার অমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাইয়ের জন্য দুঃখ হবারই কথা; বিশেষ তুমি নিজে তাকে মালতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে,—ঠিকই জোড় মিলতো। আহা, মালতী এখন কেমনটি হয়েছে—সত্যি-সত্যিই যেন ফুটন্ত মালতী ফুলটি। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তার জন্য চিরদিন মনে দুঃখ পোষণ করে কি হবে সরোজিনি?

আ। তোমার তো ঐ কথা। তার মুখখানির দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি;—আমার সোনামণি, আমার প্রফুল্লকুমার, হায় সে নিরপরাধ।—অপরাধের মধ্যে সে লেখা-পড়া শিখেছিল। সে পুরুষ মানুষ হয়ে কিনা আজ তার এই দণ্ড! তার চির-প্রফুল্ল, স্বভাব-প্রফুল্ল মুখখানি যেন সদাই ম্লান! জোর ক'রে মনের ভাব চেপে রাখে, জোর ক'রে হাসে; আমি এ সব বুঝতে পারি নে? আগে যার চুলটি একটু এদিক ওদিক হলে সহ্য হত না, জামার কাটি একটু অপছন্দ হলে পরত না, এখন সে যা-হয় তাই পরে, চুলে একবার চিরুণী দিতে হয় তাই স্থায়, ভদ্র-সমাজে তো বাহির হ'তে হবে। ছুঁড়ী সরলার উপর লেগেই আছে। কথায়-কথায় আমার বিধবা বোনকে কিনা ঠাট্টা করে "সুন্দরী"। ঈশ্বর তাকে সুন্দর করেছেন, সে কি করবে? একবিন্দু বুদ্ধি নেই, এ-দিকে ন্যাকার মত হিংসে টুকু, নষ্টামী টুকু, ষোলো আনা আছে। আর কেবল চিনে রেখেছে টাকা। সাধ করে' খুদী ঠান্‌দি ওর ভাইকে ব'লে ছিলেন, "কর পুরুষ বড় মানুষ হ'য়েছে?" আজ কিনা আমার বোন তার বাপের ভিটেয় বেঁটা খেয়ে একবেলা দুটো ভাত পায়, আর তাঁর দাসীগিরি করে! এ সব দেখে-শুনেও প্রফুল্ল চুপ করে' থাকে!

দ। পাগ্‌লা বলে কি—"আমি প্রায়শ্চিত্ত করচি—দেখি কত ধানে কত চাল।" মোট কথা, যার ওপর আন্তরিক ও স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকে, তার ওপর কথা কইতে প্রবৃত্তিই হয় না। নইলে পদ্মমুখী তো পদ্মমুখী, নূরজাহান, এলিজাবেথের মত গেছো মেয়ে-মানুষকেও প্রফুল্ল-কুমার চোখের ইঙ্গিতে পরিচালিত করতে পারে। প্রফুল্লরও অবশ্য অন্যায় আছে,—সে পদ্মমুখীকে কিছু বলে না সত্য, কিন্তু কখনো একটু শেখানো-পড়ানো, বোঝানো-সোঝানো, একটু আদর-সোহাগ করা—তাও নেই। ভালও বাসি নে, মন্দও বাসি নে, কথায় বলে "দেবতা তুমিও আমায় ঘাঁটিও না আমিও তোমায় ঘাঁটাবো না"; —না এ-দিকে, না ও-দিকে,—নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম সেজে আছে। বৌটো ন্যাকা হাঁদা—যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি; এর উপর যদি প্রফুল্ল একটু চেষ্টা করত, তবু না-হয় ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত হত;—তা নয়, সে আপন বুদ্ধি-মতই চলেছে, প্রফুল্লও হা'ল ছেড়ে বসে আছে। এদের মজা মন্দ নয়।

আ। তাকে শেখাবে কি? ছয় মাসে তাকে আমি পঞ্চাশ পর্যন্ত গণ্‌তে শেখাতে পারি নে। আর আমার সরলা সাত বছর বয়সে চারশো নাম্‌তা মুখস্থ বল্‌তে পারত। তাকে শেখাতে কি আমি চেষ্টার ত্রুটি রেখেছি? বাড়ীতে পাড়ার পাঁচটা মেয়ে-ছেলে এলে, একটু "এসো বোসো" তাও গুছিয়ে বলতে জানে না। কম অদৃষ্টের ভোগ! কি গড়ন! যেন কচ্ছপ। যাক্‌, ওসব কথা আর তুল না, যা বল্‌ছিলে তাই বল।

দ। ভাগ্য মান্‌লে দেখতে হয়, যে সন্তান না পেয়ে বিধবা হ'ল, তার ভাগ্য বিলক্ষণ মন্দ বৈ কি! বিবাহ সৃষ্টিরক্ষার জন্য, অর্থাৎ সন্তান-প্রাপ্তির জন্য। ইহা ঈশ্বরাভিপ্রেত, অতএব বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যার জন্য। কারণ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম, না করা ঘোর অধর্ম্ম। স্ত্রীলোকের স্বামী সেই ধর্ম্মচর্য্যার একমাত্র সহায়,

একমাত্র উপায়, এবং স্বামী নিজের ও সন্তানের রক্ষাকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা; এজন্য স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। কেননা স্বামী ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষাই হ'ল না—জন্মই বৃথা হ'ল, মহাপাপ হল। স্ত্রীলোক সুশিক্ষা পেলে বুঝতে শেখেন, এবং স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করেন। এখন দেখ, দ্বিতীয় স্বামী যখন 'স্বামী' অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার সহায়, তখন তাঁ'কে ভক্তি অবশ্যই করতে হবে। পুরুষেরা ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রে সেই ভার্য্যাকে অবশ্যই সহধর্ম্মিণী মনে করেন এবং স্ত্রীর মত শ্রদ্ধা করেন,—উপপত্নী বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপায় মাত্র মনে করেন না; অন্ততঃ ইহাই কল্পনা করতে চাই। নতুবা পুরুষেরও ভার্য্যান্তর-গ্রহণ উপপত্নী-সংরক্ষণ মনে করতে বাধ্য হ'তে হ'বে। এবং তা ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু সন্তানপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক; অথচ ইন্দ্রিয় উদ্দেশ্য নহে, উপায়;——end নহে means, এই যে উপায় কথাটি বল্লুম, এই means, ইহাই মায়া—অর্থাৎ সৃষ্টির উপায়। সৃষ্টির জন্য আবশ্যক—divine necessity. কিন্তু উপায় অনেক সময় মানুষকে এমন অভিভূত করে ফেলে যে, মানুষ তখন উদ্দেশ্য ভুলে উপায়েরই সেবা করে। ইহাই পাপ, ইহাতেই পতন, সংসারে যত-কিছু দুঃখ, তা'র কারণ এই উপায়ের অযথা সেবা, এবং উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলা। তুমি দরিদ্র—তুমি পীড়িত, তুমি জান না কিসে দারিদ্র্য যায় এবং কিসে পীড়া সারে;—এ সকল অনেক গূঢ় কথা; অথচ উপায়কে মোহময় না করলে সৃষ্টি হয় না, লীলা হয় না; ইহাই বেদান্তের 'মায়া'। এই মায়া ভেদ ক'রে তবে ব্রহ্মে পৌঁছিতে হবে,—গাছে উঠেই এর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে, মইএর ওপর বসে পা দোলাতে থাকলে চলবে না। অর্থ সুখের উপায়, কিন্তু মানুষ সময়-সময় এমন দশায় পড়ে যে, তখন সে সুখ দিয়েও অর্থ ক্রয় করে, তখন সে কেবল প্রাণ পাত ক'রে দেহ নষ্ট ক'রে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকে—অর্থকেই উদ্দেশ্য করে ফেলে। যদি নিজেই মলুম তবে অর্থে কি হবে, তা ভুলে যায়। এই জন্যই সাধুরা সঞ্চয় করেন না, অবশ্য গৃহীকে সে-উপদেশ দেই না; তাদের বরং খুব সঞ্চয় করাই ধর্ম্ম। এখন দেখ, ইন্দ্রিয়-আলোচনা সন্তানের জন্য, কিন্তু পাছে জীব এতে বিরত হয়ে সৃষ্টিরক্ষার সাহায্যে প্রলুব্ধ না হয়, এজন্য এতে সুখ নিহিত আছে। কিন্তু দেখ, জগতের লোক উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে উপায়ের দিকে সে ধায়,—কত খুনোখুনী, কত বিরহ হা-হুতাশ, কত রোগ-শোক ভোগ করছে। এই তো মায়া, এই তো পাপ, এই তো মরণ, এই জন্যই দম্পতি-বন্ধন। কিন্তু সন্তান পেয়েও যদি বিধবা আবার বিবাহ করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি উপায়ে মজেছেন, আসক্তিতে মজেছেন, এবং তাঁর স্বামী-প্রীতি কামজ; এজন্য তিনি অতি অশ্রদ্ধার পাত্রী। পুরুষের বেলাও ঠিক ঐ কথা। এরূপ করিতে থাকলে সমাজেও অশান্তি হয়—অতএব তাও পাপ। কারণ সমাজ ধর্ম্মচর্য্যার প্রধান সহায়। পুরুষের এরূপ আচরণে ততটা অশান্তির ভয় নেই, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলা ভেবে দেখ দেখি—পাঁচ সহোদর পাঁচ বাপের নাম বলবে! আইজাক্ নিউটন্ অত বড় লোক, তাঁর মাতা কি না তাঁর পিতার মৃত্যুর পরই অমনি তাঁকে তাঁর পিতামহীর কাছে ফেলে রেখে আবার বিবাহ করলেন, এজন্য নিউটন্ মাতার প্রতি আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সকল সন্তানই গর্ভধারিণীকে এক্ষেত্রে ঘৃণা করবে, কিন্তু পিতার প্রতি এজন্য ততটা ঘৃণা আসে না—এ স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানের দাবী স্ত্রীলোকের অবশ্যই

আছে। যার প্রথম স্বামী সন্তান না দিয়ে মরে গেলেন, তিনি স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা তো কিছুই করে যেতে পারলেন না,—তাঁর সঙ্গে বিবাহের ধর্ম্মানুমোদিত উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয় নি। স্ত্রীও দুর্ভাগ্যবতী বটে। এখন তাকে বাধ্য হয়ে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্যে পত্যন্তর গ্রহণ করতে হবে— কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য, সন্তানের জন্য। সংসারে আর একটি অতি মহৎ, অতি পবিত্র পদার্থ আছে, তা প্রেম; প্রেম বলতে কামজ আসক্তি মনে কোরো না—তুমি বুদ্ধিমতী, অবশ্য বোঝো। এই মধুর পবিত্র প্রেমের জন্য আমরা অন্য সব তুচ্ছ কর্‌তে পারি। এখন যদি স্ত্রী মৃত-স্বামীর প্রেমে পূতাত্মা হয়ে সন্তানপ্রাপ্তির দাবী তুচ্ছ করেন, তবে কার সাধ্য তাঁকে পুরুষান্তরে প্রেরণ করে!—কর্‌তে যাওয়াও মহাপাপ। কত পুরুষ বন্ধ্যা স্ত্রী-সত্ত্বেও বিবাহ করেন না, স্ত্রী সন্তান না রেখে মরে গেলেও আর বিবাহ করতে ইচ্ছে করেন না; কিন্তু এরূপ পবিত্রাত্মা পুরুষ বা স্ত্রী সংসারে খুব বেশি নেই। সাধারণ লোক নিয়েই আমাদের সমাজ, সাধারণ লোকের যা সাধ্য, তারও ব্যবস্থা সমাজে থাকা আবশ্যক। Unrealizable ideal নিয়ে কি সর্ব্বদা চলা যায়? স্ত্রী যদি বিধবা হওয়ার পর সন্তানের দাবী ত্যাগ না করেন, তবে জোর করে তাঁর ধর্ম্মানুমোদিত দাবী হতে বঞ্চিত কর্‌বার তুমি কে? এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম? তারই না আজ এই পরিণাম! গাভী হিন্দুর দেবতা, কিন্তু আজকাল ভারতের গাভী অপেক্ষা অযত্ন পৃথিবীতে আর কোথাও কোনো গৃহ-পালিত পশুর আছে কি?

আ। রাগ কর কেন? একটু ভেবে দেখ দেখি, মৃত স্বামীর আত্মার এতে কি কষ্টই হ'ল! তিনি যে অন্তরীক্ষ থেকে বল্‌তে থাকবেন, —"এই তোমার ভালবাসা! এই তোমার পবিত্রতা! তখনকার কথা কেমন করে ভুল্‌লে? আমায় কেমন করে ভুল্‌লে?

দ। ভুল। আত্মা দেহত্যাগের পর পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি রাখে না; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জন্মান্তর গ্রহণ করে ফেলে, একজন মরে, তার প্রাণের জনেরা কেঁদে আকুল, কিন্তু দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মা তাঁদের জন্য এক বিন্দুও সহানুভূতি দেখায় না। আত্মিক দেহ (psychic bodies) অনেক স্থলে তাদের জীবিত আত্মীয়কে দেখা দিয়ে এ-কথা বলে গেছেন, এর অনেক বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু যদি কোনো পার্থিব পদার্থ বা ব্যক্তির প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকতে কেউ দেহত্যাগ করে, তবে তার জন্মান্তরগ্রহণে বিলম্ব হয় বটে; এবং প্রেতাত্মা সেই ব্যক্তি বা পদার্থের পার্শে ঘুর্‌তে থাকে,—এ অতি অনুন্নত আত্মার চিহ্ন। এরূপ প্রমাণও পাওয়া গেছে, উন্নতাত্মা দেহত্যাগের পর দিব্য-জ্ঞানলাভ করে' বুঝতে পারে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য তার স্ত্রীর পুনর্বিবাহ আবশ্যক। পার্থিব প্রণয়ের জন্য তার আত্মার গাত্রদাহ আসে না। ম্যাডাম ব্ল্যাভ্যাস্‌কিও এই কথা বল্‌তেন। কিন্তু এমনও অবশ্য দেখা গিয়েছে যে স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিবাহে প্রস্তুত, কিম্বা বিবাহ করেছেন, এমন সময় মৃত স্বামী বা স্ত্রীর আত্মা দেখা দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ কথা ধরতে হ'লে পুরুষেরও পুনর্বিবাহ-কালে এ কথা একবার চিন্তা করা উচিত। তা আমরা করে থাকি কি?

আ। পুরুষের এ বিষয় অধিক ভাবা উচিত। স্ত্রীলোক—বিশেষত হিন্দু-স্ত্রী স্বামীকে যত ভালবাসতে জানে, পুরুষ প্রায়ই স্ত্রীলোককে তত ভালবাসতে পারে না। এজন্য মৃত স্ত্রীর প্রেতাত্মার কষ্ট আরো অধিক;—তোমরা তার কি বুঝবে?

দ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু পুরুষেরা তা পালন করেন না—অশৌচান্ত হতে ভর সয় না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম কেবল মুখে, আদর্শ কেবল অবলাদের ঘাড়ে।

আ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবার বিয়ে দিতে চাচ্ছ,—কিন্তু ব্যভিচার করলে স্ত্রীলোকের ক্ষমা আছে কি?

দ। যার ক্ষমা আছে এমন পাপ পৃথিবীতে নেই। Actionএর reaction, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। ফলভোগ করতেই হবে। তবে ক্ষমা অর্থে আমি যদি প্রতিক্রিয়া দ্বারা ফলখণ্ডন বুঝতে চাই, তবে ক্ষমা আছে, নতুবা ফলভোগ অনিবার্য্য। পাপ অর্থে যার ফলে আমাকে কষ্ট পেতে হবে, কিন্তু মোটামুটি অনেকগুলি জড়িয়ে নিয়ে একটি "আমি" হয়েছি—আমার দেহ, আমার মন, আমার আত্মা ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই পাপ করা যেতে পারে। ব্যভিচারে আর কিছু হোক্ আর না হোক্, আত্মা কলুষিত হবেই। তার ফলভোগ এজন্মে (যদি হয়) অনুতাপে, মৃত্যুর পর হ'লে আত্মার অধোগতিতে। কিন্তু অনুতাপরূপ প্রতিক্রিয়া-দ্বারা নিশ্চয়ই পাপক্ষয় হয়। তবে একটি কথা,—"এখন পাপ করে রাখি, শেষে অনুতাপ করে ঝেড়ে ফেলব," এমন মনে রেখে যে পাপাচরণ করে তার পাপক্ষয় কখনো হয় না। কোনো কার্য্যবিশেষে আত্মার পাপ হয় না, আত্মার পাপ হয় অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্যে। আমি না বুঝে সাপের মুখে হাত দিলে আত্মার পাপ হয় না, দেহের পাপ হয়; এবং দেহের ফলভোগে অর্থাৎ সর্পদংশনের জ্বালায় ও মৃত্যুতেই তার ফলশেষ হল। আমি এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি, তাতে তোমার বোঝা উচিত যে, বালবিধবার পুনর্বিবাহে একবিন্দুও পাপ নেই বরং পুণ্য। যদি আন্তরিকতা না থাকে, তবে বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যেই বরং পাপ, অনিচ্ছায় সহমরণে তো আত্মহত্যার পাপ। এবং যে তার সমর্থন করে সে নরঘাতী রাক্ষস। যদি কোনো শিক্ষাভিমানী আমার এই কথার প্রতিবাদ করতে আসে, তবে আমি তাকে একথা বুঝিয়ে দিতে পারি। শাস্ত্রে যদি এ principleএর একবিন্দুও বিরুদ্ধবাদ কোথাও থাকে তবে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হলে সে শাস্ত্রগ্রন্থ দগ্ধ করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি এমন অসার পাপময় উপদেশের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—তা হলে এতদিনে 'হিন্দু' নাম পৃথিবী হতে লোপ পেত।

আ। ছি ছি—কি সব বলতে লাগলে?

দ। আমি কায়স্থ, আমি এসব বলবার কে? এখনো ব্রাহ্মণ আছেন। হরিদাসবাবু কাল এই সব আমাদিগকে বুঝিয়েছেন—তিনি শিক্ষিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু যা বলছিলুম, মনের অগোচর পাপ নেই। বালবিধবার পুনর্বিবাহ কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য সন্তানের জন্য; যে-নারী ইন্দ্রিয়সেবার জন্য, পুনর্বিবাহ করে, লোকে টের না পেলেও সে মনে-মনে বোঝে;—তাই-ব্যভিচারই পাপ; কেননা উপায়ে আসক্তি এসেছে, তার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। উদ্দেশ্য মন্দ, এজন্য পাপ। আইন-বিজ্ঞান বা বিচারনীতি অর্থাৎ Jurisprudence উদ্দেশ্যের উপরেই বিচারকের নজর রাখতে বলে, ঈশ্বর তাই রাখেন। লর্ড লিটনের "Night and Morning"এর সেই কবরে লেখা হয়েছিল—"Man judges the deed, but God the circumstance"—ঠিক কথা, বালবিধবার পুনর্বিবাহে ব্যভিচার হল না।

আ। কিন্তু আর একজন স্বামী নিয়ে স্ত্রী কি তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে?

দ। না পারে তবে তার বিয়ে করার আবশ্যকতা নেই। ব্রহ্মচর্য্য ছেড়ে যদি বিধবা ধর্ম্মরক্ষার্থে বিবাহে রাজী হল, তবে

পিতা বা পিতৃস্থানীয় যে-পাত্রের হস্তে তাকে অর্পণ করবেন, তিনি অবশ্যই দেবতুল্য পূজ্য। যে-স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে পুনর্ব্বিবাহ করতে হল, তার দুর্ভাগ্যের জন্য ভগবানের নিকট অনুশোচনা করা উচিত। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা উচিত, যেন তার ইন্দ্রিয়ে আসক্তি না আসে। সেও যেন ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করে, "আমি কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্যই পত্যন্তর গ্রহণে বাধ্য হলুম, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো প্রভু।" মোট কথা এই যে সকল কথা বল্লুম, তা মানুষকে দেবতাজ্ঞানে বল্লুম। কয়জন নর-নারী এত ভেবে-চিন্তে কাজ করে? আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেসকল বিধি-ব্যবস্থা রেখে গিয়েছেন, তার অনেকটা যেন প্লেটোর 'আদর্শ সাধারণ তন্ত্রের' মত (Plato's Ideal Republic)—কি তার চেয়েও বেশী। তাঁরা মানুষকে একদম্ দেবতা গড়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। বেশ তো, যিনি পারেন তিনি দেবতা হউন, সে তো ভাল কথা এবং যাদের শাস্ত্রে এইসকল পন্থা নিরূপিত আছে তারাও ধন্য। কিন্তু ঘরে-ঘরে দেবতা কোথায় পাব? মাঝে পড়ে এই নিরপরাধা অবলাদের জোর করে দেবী বলাতে গিয়ে কেলেঙ্কারীর বেহদ্দ করছি। অন্যথা তাদের চোখের জলে ভাসাচ্ছি, পাপ সঞ্চয়ের চরম করছি। নিজেরা কাপুরুষ, ধর্ম্মকর্ম্মহীন, নরপ্রেত, কিন্তু ঘরে এসে দেবতা নিয়ে থাক্‌বো! মতল্‌বটা এই! পিশাচ কখনো দেবীর যোগ্য হয়? এই সকল রাক্ষসের পাপেই আজ আমাদের এই দশা।

আ। পাগল হবে নাকি? তোমার সম্মুখে কি সেই রাক্ষসের দল দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

দ। সত্যিই সরোজিনী! এসব কথা মনে হলে আমি পাগল হই। সরলার দিকে চাইলে, তার বিনা-অপরাধে নিরর্থক দণ্ডভোগের কথা ভাবলে আমি পাগলই হই। এক এক জন যেন মহা সাধু! নায়েব মশা—

আ। দম্‌খেয়ে গেলে যে?—

দ। না—কিছু না—

আ। আমি বুঝেচি;—তুমি মনে কর নায়েব-ম'শায়ের গুণকীর্ত্তি আমি কিছুই শুনি নি।

দ। সে কি? এসব কথা তোমার কানে কোথা হতে এল? আমরা কোথায় কথাটা চাপা দেবার চেষ্টায় আছি—

আ। হিমীর মুখে প্রথম শুনি। শেষে বিশ্বদূতী খুদীঠান্‌দির কাছে আগাগোড়া—সাধ-সীমন্তন-ষষ্ঠী-পূজো—সব খবর পেয়েছি।

দ। কি বল দেখি— তোমার খুদী-ঠান্‌দির বয়ানটা কি?

আ। সেই ওদের শশীর কথা তো? আহা মেয়েটার অল্প বয়েস, দেখতে-শুন্‌তেও, কেমন সুন্দর। তা এতদিন তো তার বাপের বাড়ীতে কেউ তার নামে একটা কথাও বলতে পারে নি! তার বাপ গরীব বুড়ো ব্রাহ্মণ, অবস্থাও ভাল নয়; ভাবলে নায়েবের বাড়ী থাকলে মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পাবে থাকুক। শেষে এই কাণ্ড! নায়েবের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'তে গেল, যেন গো-বেচারী, শুনেছি তো মহাধার্ম্মিক, সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটায় ঘাটে মেয়েদের নাইবার যো নেই। ছেলের বিয়ে হ'য়েছে বলে' আর বিয়ে করলে না। শশীর বাপের কাছে গিয়ে বল্লে, এখানে আমার দুটো রেঁধে ভাত দেবার কেউ নেই, বউ-মা ছেলে-মানুষ, তাকে দিয়েই বা কি করে রাঁধাই; যদি শশীকে আমাদের বাড়ী রাখেন —সে তো আমার মেয়ের মতন"। দেখ—এতে বুড়ো ব্রাহ্মণ কি করেই বা বুঝবে তার মতলব; যাক্ শশী গলায় দড়ি দিয়ে মরে ভালই করেছে। লজ্জায় তার ভাইটাও নাকি আফিং খেয়ে মরেছে। আহা ছেলেটির নাকি গেল-বছর বিয়ে হয়েছে। বুড়ো ব্রাহ্মণের আর কেউ রইল না। শশী কিন্তু বড় ভাল মানুষ ছিল আহা!

দ। আবার আজ সকালবেলা যখন তর্ক-রত্ন-মশায় বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলছিলেন, তখন নায়েব-ম'শায়ের সম্মতিসূচক মাথানাড়ার ভাব দেখছিলে তো? কি বলব ব্রাহ্মণ, নইলে নিশ্চয় তাকে গুলি করে' মারতুম; তার পর যা হবার হ'তো।

স। তাই বলে সরলার বিয়েতে আমার মত নেই।

দ। দেখ সরোজিনী, একটু ভেবে দেখ, সরলা কেমন করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে? ছেলে-খেলা বটে? পরের বেলা ব্যবস্থা দেওয়া বড় সহজ। আমার শ্বশুরের বয়সী সেই ভদ্র লোকটির প্রতি সরলার এক সপ্তাহের মধ্যে এক বিন্দুও আসক্তি হওয়া সম্ভব কি? বাঙালীর নভেলে সম্ভব বটে—Effeminate cowards! যদি সে বেচারা বেঁচেও থাকত, তবু না-হয় আমি সরলাকে সৎশিক্ষা দিয়ে তার মনের স্বাভাবিক গতির পরিবর্ত্তন করতে পারতুম। সরলা আজো অর্দ্ধ-শিক্ষিত। তার উপর সে এতদিন এত আমোদ-আহ্লাদ করে, সখ্ করে কাটিয়েছে। যখনই তোমায় নিয়ে কল্‌কাতায় থিয়েটার, সার্কাসে গিয়েছি, তাকে না নিয়ে যেতে পারি নি। যখনই আমি গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়েছি, সে অমনি সেজে-গুজে আমার সঙ্গে বেরিয়েছে। যেখানে যে ভাল জিনিষটি দেখেছি, যে ভাল কাপড়-চোপড় পেয়েছি, তার জন্য কিনেছি! এজন্য তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কত রাগ করতেন। তার চার-ধারে আমরা তেমনি আমোদ আহ্লাদ করব, আর সে অহল্যা-পাষাণী হয়ে থাকবে? যদি একটি সন্তান থাকত, যদি মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত থাকত, তথাপি না-হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারত;—বাহ্য দুঃখ তুচ্ছ করতে পারত। সে কি অপরাধ করেছে? যদি বুঝতুম, তার বিয়ে দিলে কোনো অশাস্ত্রীয় কার্য্য হবে, অথবা সমাজের অমঙ্গলকর বা তার আত্মার কোনো অপবিত্রতার ভয় থাকবে, তবে অবশ্য সহ্য করতুম। বিধবা-বিবাহ সমাজে এতদিন নিশ্চয়ই প্রচলিত হত, কেবল পুরুষেরা হৃদয়হীন, উৎসাহহীন, উদ্যোগহীন, অশিক্ষিত এবং কাপুরুষ বলে এতদিন হয় নি। তাঁদের সুখটুকু তো ষোলো আনা বজায় আছে! কাজেই গা তাতে না! পুরুষেরা লুকিয়ে পলাণ্ডু, কুক্কুট, সুরা ইত্যাদি সবই উপভোগ করে শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করে কলির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে; কিন্তু বাল-বিধবার বিবাহটা তো আর লুকিয়ে হয় না! বিলেতেও লুকিয়ে গিয়ে সিভিল সার্ভিস্ পাশ করে এসে লুকিয়ে থাকা চলে না। বিলেত-ফের্ত্তারা তবু একটা আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু এরা যায় কোথায়? এরা যে লাখে-লাখে তুষানলে পুড়ছে—অথচ অকারণে, নিরপরাধে! যার ভগ্নী বা কন্যা বিধবা হয়, সে দিন-কতক মনে মনে খানিক ইচ্ছুক হয় বটে, কিন্তু সমাজের কর্ম্মনাশা তর্ক-রত্নদের ভয়ে মনোভাব প্রকাশ করে না। তারপর নিজের ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের সুখ, ছেলে-পুলে কোলে করতে করতে, সব ভুলে যায়—সব জুড়িয়ে যায়। লজ্জাবতী অবলারা নীরবে সব সহ্য করে তাঁদের নিষ্ঠুর সমাজ-প্রপীড়িত জীবন অতিবাহিত করেন। হায় মা! কেন তোমরা এ পাপিষ্ঠদের গর্ভে ধারণ করতে এ অধঃপতিত হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ কর? সময় সময় মনোবেগ এমন হয়, যে তখন মনে হয়, যদি আমাদের সমাজ ইংরাজদের মত বিশৃঙ্খল হয়েও আমরা তাদের শতাংশের একাংশও যোগ্যতা লাভ করতে পারতুম, তাও বাঞ্ছনীয় ছিল! পুরুষের পুরুষত্বে, বীরত্বে, স্ত্রীলোকের ভক্তি আসে, admiration আসে, আত্মসমর্পণ

আসে ;—নইলে ডেসডেমোনা মুর ওথেলোর পায়ে লুটা'ত না, রক্ষোরাজভগিনী সূর্পণখা জটা-বল্কলধারী লক্ষ্মণের কাছে নাক রেখে যেত না। সে ক্ষমতা তো নেই! দেশের স্ত্রীলোকদেরও "লক্ষ্মী বউ" করে তুলেছে—যত বীরত্ব এই কোমলাঙ্গীদের ওপর।

আ। ছি ছি ছি, কি সর্ব্বনাশ! কি সব পাগলের মত আবোল-তাবোল বক্‌তে আরম্ভ করেছ? হিন্দুর মুখে ঐ সব কথা! ছি ছি! তোমার রক্ত গরম হয়ে উঠলে আবার সেই আগেকার মত সাহেবী মেজাজ ফিরে আসে। তোমার আমি কিছুতেই পেরে উঠলুম না! বুঝি—ছি ছি—

দ। কিন্তু ব্রাহ্মদের আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব, তাঁদের মধ্যে দেবতার মত লোক আছেন। আমি আশা করি, আমাদের দূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন দেশের সমস্ত লোকই পবিত্র পরিত্রাণপ্রদ উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মেরাই বাস্তবিক এ-যুগের আদর্শ মানব। তাঁরা আমাদের আপনার জন। মিসেস্ মুখার্জ্জীকে না পেলে কার কাছে তুমি এমন সুশিক্ষা পেতে? বাংলার প্রায় পনেরো আনা সাহিত্য আজ তাঁদের হস্তে। আমাদের ঘরে স্ত্রীশিক্ষা তাঁদেরই হ'তে—ব্রাহ্মসমাজ না থাকলে বিলাত-প্রত্যাগত এই সকল ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানগণ আজ কোথায় আশ্রয় পেতেন? তোমার সমাজ তো রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু অপেক্ষা নায়েব মশায়কেই অধিক পছন্দ করেন! * * বাবুর মেজো ছেলে পুলিস সাহেব হয়েছেন, লুকিয়ে কেল্‌নারের খানা খেয়ে থাকেন, আরো কত কীর্ত্তি করেন, এ open secret সবাই জানে। অথচ পূজোর সময় তিনি 'পাঁঠা' ধরেন, ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করেন, ব্রাহ্মণেরাও খান—কেননা তিনি প্রকাশ্যে বিলেত যান নি বা প্রকাশ্যে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হন নি।

আ। তুমি লজ্জা-সরমও ত্যাগ করতে আরম্ভ করলে? কথাগুলি ঠিক ব্রাহ্মদের মতই বলছ; তোমার টান আজো যায় নি!

দ। তাঁদের প্রতি আমাদের নিশ্চয়ই আন্তরিক টান আছে। তাঁদের মধ্যে বাড়াবাড়ি দেখলে প্রাণে আঘাত পাই! তাঁরা আমাদের আপনার জন। লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাঁদের অপেক্ষা শিক্ষিত আর কোনো সম্প্রদায় ভারতে নেই। তাঁদের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

আ। তাঁদের ভাল করবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু হিন্দু-সমাজেও যে ভাল লোক থাকা একান্ত অসম্ভব নয়, একথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? এখনো হিন্দু সমাজে এমন অনেক রমণী আছেন, যাঁরা দেবী। তুমি এরূপ স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব হিন্দু-সমাজে অসম্ভব মনে করে আমাদের প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছ। হিন্দু নারীকে বিধর্ম্মীর চোখে দেখ্‌চ! বড়ই মর্ম্মাহত হলুম।

দ। ক্ষমা কর সরোজিনী। আমি সত্যি সত্যিই ভাল বুঝতে পারি নে। তোমাকে না পেলে আমার মনের দশা আরো কি হ'ত জানি নে। কিন্তু তুমি একবার ভেবে দেখ—সরল নিরপরাধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যা

বিপদে

এ যে পঙ্কিল পথ পিচ্ছিল অতি শঙ্কিত চিত্ত তাই হে,
তাহে উছল নদী, চঞ্চল গতি, তা'রি তট বাহি' যাই হে।
ক্রমে সন্ধ্যা আসিছে অন্ধতামসে নীলোজ্জ্বল গগনে,
ওই পেচক ঝিল্লি উল্লাসে বসি ঝঙ্কার করে সঘনে;
ক্রমে পন্থা না হয় লক্ষ্য পদে কণ্টক ফুটে লক্ষ,
তব দীপ্ত আলোক ভিন্ন রক্ষা অন্য উপায় নাই হে।
একি বিদ্যুৎদ্যুতি ঘন ঘোরঘটা গর্জ্জন গুরুগম্ভীরে,
একি মত্ত বাত্যা উত্থিত প্রভো কেমনে যাইব মন্দিরে?
কোথা বিপদ-বিপদ-মিত্র, আজি জাগিছে তোমারি চিত্র,
আজি মুক্ত কর এ ক্ষণিক ভক্তে পদপাশে দিয়ে ঠাঁই হে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

গার্হস্থ্য

হিন্দুর প্রথম আশ্রম গার্হস্থ্য। ইহার উপর হিন্দুর আর তিন আশ্রম নির্ভর করে। হিন্দুর আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ...ন্তু কঠোর এবং কষ্টসাধ্য। সংসারে রিপুগণের ...বল্যহেতু মানবদিগকে তাহাদিগের সহিত অহরহ ...গ্রাম করিতে হয় বলিয়া সংসারাশ্রমেই মানবের ...র্ণ মানবত্ব বিকশিত হয়। মনুষ্য সামাজিক ...ব, একাকী থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। ...াতে না তাহার শান্তি, না তাহার সুখ, না ...য় কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয়। এবং অন্যদিকে ...ল সে ইহ-লোক হইতে জ্ঞান কি ধর্ম্মের ... উন্নতি লাভ করিয়া পরলোকের সম্বল ...ক পারে না। অসাধারণ প্রকৃতিসম্পন্ন দুই এক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সামাজিক সাহায্য ভিন্ন কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহস্থাশ্রম ঈশ্বর-প্রদত্ত পবিত্র আশ্রম। মাতা-পিতা, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা লইয়া যে সম্বন্ধ তাহা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ও স্বর্গীয়। অন্যান্য জীবের শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতে যত সময় ব্যয়িত হয়, মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করিতে হয়, মনুষ্য-শিশুর প্রতি তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক চাই। মনুষ্যের ভাগ্য যেমন অবিশ্রান্ত দুঃখের অধীন, তাহাতে সুরসাল গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে শীতল হইবার স্থান

আর কোথায়? গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিল, সে আপনাকে আপনি ঠকাইল; তাহার জীবনধারণ-করা বৃথা। গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম্মসাধনের সোপান বলিয়াই হিন্দুর চতুরাশ্রমের মধ্যে ইহার প্রাবল্য এত অধিক। কত শত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমলস্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতিগৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোক-সমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে দয়া গৃহস্থাশ্রমেই মানবের প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরো উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জনসমাজের কল্যাণসাধন করে, অন্যদিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। উজ্জ্বল শ্বেতবস্ত্রে সামান্য দাগ লাগিলে যেমন তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়, তেমনই সংসারাশ্রমে যদি মানব রিপুপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় চরিত্রকে কলুষিত করে, তবে তাহা মানব-চক্ষে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

গৃহস্থাশ্রম একটি বৃক্ষবিশেষ। ধর্ম্ম ইহার শাখা, মনুষ্য ইহার পত্র, দৃঢ়ব্রত ইহার মূল। দুঃখ কলহ এবং তাপ ইত্যাদি ঝঞ্ঝাবাতে ইহা উন্মূলিত হইবার আশঙ্কা থাকে। পরন্তু শীলতা স্বীয় সুশীতল বারি অভিসিঞ্চনে বৃক্ষটিকে সুদৃঢ় রাখে। শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করায়। বৃক্ষকে ফল-পুষ্প-সমন্বিত করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করে। সুমতি এই বৃক্ষের রস, ইহা বৃক্ষের সর্ব্বস্থানে গমন করত বৃক্ষকে পুষ্ট করে। যতক্ষণ বৃক্ষ সুরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ ইহার সুশীতল ছায়ায় সুখে উপবেশন করিয়া দ্রোহ, ঈর্ষা, দ্বেষাদির প্রচণ্ড কিরণ হইতে মানব আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। যদি সুমতিরূপী রস এবং শীলতারূপী জল না থাকে, তবে বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া যায়; অথবা রিপু আদি প্রচণ্ড বাত্যা-দ্বারা উৎখাত হইয়া পতিত হয়। তখন দুঃখ কলহ সন্তাপ প্রভৃতি আগমন করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করে। কুটুম্বাদির ক্লেশের আর অবধি থাকে না। যাহারা আপনার, তাহারাও তখন পর হইয়া যায়। কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপও করে না। সংসারাশ্রম কঠোর হইলেও পরীক্ষা, শিক্ষা ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের দিকে ইহা যেমন সাহায্য করে, তেমন আর কোনো আশ্রমেই করে না। এতদ্ব্যতীত সুখ, স্বচ্ছন্দতা দ্বারা জীবনকে মধুময় ও জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত করিতে সংসারাশ্রমই মানবের একমাত্র অবলম্বন।

কেহ কেহ সংসারাশ্রমকে শকটের সহিত তুলনা করেন। ধর্ম্ম ইহার ধুরা, ভ্রাতৃভাব এবং প্রীতি ইহার চক্র, স্ত্রী ও পুরুষ ইহার বলদ। যদি পরিশ্রম ও সাহস সহকারে সুমার্গে চালিত হয় তবেই তো ইহার কল্যাণ হইয়া থাকে। নতুবা কুমার্গে পতিত হইয়া অচীরে ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। কি-প্রকারে আপনার এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের ভাল হয় স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল এই ভাবনা, এই চিন্তা এবং এই কার্য্য। আপনার সুখে সে আপনি সুখী এবং আপনার দুঃখে সে আপনি দুঃখী। পরের দুঃখে তাহার দুঃখ হয় না; পরের সুখে তাহার সুখ হয় না। স্বার্থপর ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা-ভগিনীর কোনো সম্বন্ধ রাখে না বা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানে না। সংকীর্ণতা তাহার হৃদয়কে এত ক্ষুদ্র করিয়া

দেয় যে, তাহার মনে উচ্চভাবের স্ফূর্ত্তি পায় না। স্বার্থপর লোক দ্বারা কোনো মহদ্ব্যাপার সাধন, বা কোনো জাতির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। স্বার্থসঙ্কুচিত হৃদয় লইয়া কেহ কোনোকালে উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করিতে পারে না। পরকে ভালবাসাই স্বর্গ। যদি ভালবাসা না থাকিত তবে পরের উপকার কে করিত? সকলেই আপনার আপনার জন্য ভাবিয়া মরিয়া যাইত। ভালবাসা আছে বলিয়াই জগৎ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ভালবাসার জন্যই পিতা মাতা সন্তানের লালন পালন করেন এবং তাহাদিগের প্রীতির জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন। ভালবাসার জন্যই স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতা-ভ্রাতায় অনুরক্ত হয়। ভালবাসা না থাকিলে সংসারে নিত্য কলহ বিরাজ করিত। প্রভাতে সমীরণের হিল্লোলে যেমন পুষ্প-কলিকা-সকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের সমুদায় সদ্ভাব বিকশিত হয়। প্রকৃত প্রণয় সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত, উদার এবং সদ্ভাবাপন্ন না হইলে প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে পরের সেবা করিতে পার, এবং যাহাতে মলিন জিহ্বা হইতে একটি সুমিষ্ট কথা বাহির করিয়া বিষণ্ণ আত্মাকে সুখ-শান্তি দিতে পারে তাহার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিবে।

ভালবাসা যদি গৃহস্থের মূল হয় তবে বিনয় তাহার পুষ্প। এই পুষ্পের অবিদ্যমানে সংসার নরকময় হইয়া থাকে। মানবের পক্ষে বিনয় অমৃতাভিষিক্ত শরৎকৌমুদী। মানব জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে পারে কিন্তু যদি সে প্রভায় শমগুণ না থাকে, বিনয়-সুধা যদি তদভ্যন্তর হইতে নিঃস্যন্দিত না হয়, তবে জগতের চক্ষু কেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? যদি হৃদয় রঞ্জন করিতে চাও, ভাই-ভগ্নীদিগকে ভালবাসা-সূত্রে বাঁধিবার যদি বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে জ্ঞান-প্রসূনে বিনয়-মকরন্দ নিত্য বিরাজ করে, সেই চিররুচিপ্রদ দেববাঞ্ছনীয় সুকোমল কুসুম-শোভা সাদরে চক্ষে ধারণ কর। দেখিবে যেন স্বর্গের সম্পত্তি—অতি আদরের ধন এই বিনয়-রত্ন অযত্ন দ্বারা হৃদয়পুর হইতে নিষ্কাশিত না হয়। যে-হৃদয় বিনয়ামৃতে অভিষিক্ত নহে, সেই শ্মশান সদৃশ দগ্ধ হৃদয় আপনিও প্রকৃত সুখ-শান্তি সম্ভোগ করিতে পারে না, অন্যকেও তাহা প্রদান করিতে পারে না। যে-গৃহ বিনয়-প্রসূনে পুষ্পিত সেই গৃহেই সুখরূপী ফল ফলিয়া থাকে, নতুবা অনন্ত কষ্ট আসিয়া গৃহস্থাশ্রমকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। বিনয় অপসৃত হইলেই মানব-হৃদয়ে লঘুচিত্ততা আসিয়া পড়ে। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মে মানব সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিবে। গৃহস্বামী স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলেই তাহার আশ্রিতগণ বিফল হইয়া থাকেন। এই জন্য গৃহস্থের বিনয় থাকাই চাই এবং তৎসঙ্গে ধৈর্য্য থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্য না থাকিলে পারিবারিক কুশল ও শান্তি সংরক্ষিত হয় না। পরিবারের প্রকৃত ভার নারীগণের উপরেই পতিত হয়। তাঁহাদিগের কোমল হৃদয় সকলের জন্য যেরূপ ভাবিয়া থাকে, সকলের ব্যথায় যেরূপ ব্যথিত হয়, সকলের সুখের জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে এরূপ আর কে করে? নারী-প্রকৃতি যত সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইবে, ততই তাহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

সংসারাশ্রমে শান্তি থাকা অত্যন্ত উচিত। যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী একত্র হইয়া বাস করা যায়, এই পৃথিবীতে সেই স্থান স্বর্গতুল্য। মানব যেদিন হইতে পরিবার বদ্ধ হইয়াছে তাহার পশুভাব সেই দিন হইতে দমন হইয়াছে; অনেক পরিমাণে এবং সেই

সঙ্গে সঙ্গে সুখের পরিমাণ সহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্বার্থপর মনুষ্য সমাজের কল্যাণ-চিন্তা করে না, এবং সমাজের হিতের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত নহে, সে ব্যক্তিও পরিবারের কল্যাণচিন্তা করে এবং পরিবারের সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ এই, পৃথিবী মরুভূমি তুল্য হইলেও স্বীয় পরিবারের প্রত্যেকের শান্তি ও আরামস্থান। পারিবারিক কোমল স্নেহসম্বন্ধ কঠোর হৃদয়কে বিগলিত করিয়া ফেলে; এবং তাহা হইতেও সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থভাব ও দয়ার সহস্র সহস্র পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। সংসারে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে, তজ্জন্য ভগবান মানব হৃদয়কে স্নেহ, দয়া প্রণয় প্রভৃতি স্বর্গের কুসুমে ভূষিত করিয়াছেন। এই গুণগুলি যে-পরিবারে নাই, সে-পরিবারে শান্তি থাকিতে পারে না। সংসারে যাহাতে মনোভঙ্গ না হয় সদাই তাহার চেষ্টা দেখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রমে মনোভঙ্গের প্রধান কারণ হিংসা। ঈশ্বরের দয়া যত বেশ ধারণ করিয়া জীবের কল্যাণসাধন করে, হিংসাও তত বেশ ধারণ করিয়া পরের অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া থাকে। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শারীরিক রূপ ও পারিবারিক সৌভাগ্য —এমন কি ধর্ম্মের উপরও লোকের হিংসা হয়। অন্যের ধন, ঐশ্বর্য্য কেন আমার অপেক্ষা অধিক হইল, অন্যে লোকের নিকট এত পূজ্য ও যশস্বী হইবে কেন, অন্যে জ্ঞানে ও বুদ্ধি-কৌশলে আমাকে অতিক্রম করিল, অন্যের রূপ-লাবণ্য যেমন, আমার তেমন নয়, অন্যের যতগুলি পুত্র-কন্যা, ভাল ভাল কুটুম্ব, আমার তেমন নাই; এই ভাবিয়া হিংসুকের মন পীড়িত ও বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে। হিংসা অতি স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ মন হইতে উৎপন্ন হয়। যে আপনার সুখকেই সুখ বলিয়া জানে, অন্যের সুখে কখনো সুখানুভব করে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা হিংসাপরায়ণ হয়। আপনার পরিবার অতিক্রম করিয়া যাহার চিন্তা কখনো যায় না, তাহার হৃদয় উদার হইতে পারে না। জ্ঞানের অল্পতাতেও মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে। এই কারণে দেখা যায় এ দেশের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবল। হিংসায় স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা হয়, সুরূপা হইলেও কদাকার হয় এবং তাহার যত সদ্‌গুণ থাকুক সকলি বিনষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিতে হইলে হিংসাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থের সদাই পরিশ্রমী হওয়া উচিত। আলস্য দরিদ্রতার কারণ। পরিশ্রম ব্যতীত গৃহস্থের পালনও সম্ভবপর নহে। প্রথমত আলস্য অর্জ্জনের পথরোধ করিয়া দেয়, দ্বিতীয়ত সঞ্চিত ধনরাশির ব্যয় করিয়া থাকে। আয় বন্ধ হইলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হওয়া সুদূরপরাহত। অলস ব্যক্তির পক্ষে ঋণগ্রহণও অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ সে যখন স্বীয় অর্জ্জিত ধনরাশির ব্যয় করিয়াছে, তখন সে ঋণদাতাকে কি দিতে পারে? এমন পাপ কার্য্য নাই যাহা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি করিতে পারে না। এবং পাপে লিপ্ত হইলেই সে নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অসময়ে নিদ্রা, পরসহবাস দারিদ্র্যের হেতু। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি এগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রীতির হ্রস্বতা, বিবেক-শূন্যতা, বালক-দিগের শিক্ষায় শিথিলতা, অসতর্কতা, বুদ্ধিভ্রংশতা, চিত্তচাঞ্চল্য, সৎসঙ্গের পরিহার, কুসঙ্গ, সজ্জনের সহিত বিরোধ, পরনিন্দা এবং শীলতার পরিত্যাগ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিপদের হেতু জানিবে।

গৃহই রমণীদিগের রাজত্ব; সুতরাং দায়িত্বও অধিক। পদ্যে যে-সুখ অনুভব করা যায় না, সঙ্গীত যে-আনন্দ দিতে অক্ষম, গৃহ সে-আনন্দ দান করিতে সক্ষম। সংসারাশ্রমে স্বামীই রমণীর দেবতা। স্ত্রীলোকের পতির ন্যায় প্রিয় বস্তু ইহ-

জগতে আর নাই। তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পারে না, এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতে পারে না, তেমনি স্বামী যদি না থাকেন, শত পুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ তাহাদিগের প্রসূত সন্তান-গণ—যাহাদিগকে তাহারা আপনার হৃদয়ের ধন বলিয়া বিবেচনা করে তাহারাও বড় হইলে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে; তখন তাহারা তাহাদিগের রহিবে না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কেহ আপনার বলিয়া পৃথিবীতে থাকে সে তাহাদিগের স্বামী। পৃথিবীতে বন্ধুগণ তোমাকে সামান্য অর্থদানে কুণ্ঠিত হইবেন, কিন্তু তোমার স্বামী তোমাকে তাঁহার মন-প্রাণ গৃহ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় দুর্লভ পদার্থ অকাতরে অর্পণ করিয়াছেন। এ হেন স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে তোমাদিগের নরকেও স্থান হইবে না। অনাহারে অনিদ্রায় যত বড় ব্রতেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, আর যত বিপুল ধনরাশি দীন দরিদ্রকে দান কর না কেন, কিম্বা কঠোর তপস্যা অবলম্বনে পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, অথবা সত্য পথারূঢ় হইয়া যতই ধর্ম্মোপার্জ্জন কর না কেন, তোমার পতিভক্তি না থাকিলে সে সমস্তই ভস্মাকারে পরিণত হইবে।

সংসারে স্ত্রীগণের স্বামীই পরিচালক। এই লোভময় ভীষণ সংসারে স্ত্রীজাতি অতিশয় দুর্ব্বল প্রকৃতি। তাই তাহাদিগকে স্বামীর করে সমর্পণ করিয়া পিতা-মাতা নিশ্চিন্ত হন। স্ত্রী-জাতি যৌবন-মধ্যাহ্নে স্বামীর আশ্রয়ে উপনীত হইয়া পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হয়, এবং আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। স্ত্রীজাতীর স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, বিপদের বন্ধু, সম্পদের সখা, দুঃখের সহানুভূতি, আনন্দের প্রীতি, ধর্ম্মের সহায়, এমন কি সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে এমন সমভাগী তাহাদের আর কেহ নাই। সংসার-ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী। দুইটি প্রাণ একই লক্ষ্য করিয়া আজীবনের জন্য ছুটিয়াছে। স্বামী পথপ্রদর্শক, স্ত্রী অনুগামিনী, স্বামী কায়, স্ত্রী তাহারই ছায়া মাত্র। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর অন্য গতি নাই। কিসে তাঁহার শুভ হইবে, স্ত্রীর জীবনে সেই ধ্যান-ধারণা। স্বামীই স্ত্রীলোকের জীবন-তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী। কাণ্ডারী ব্যতীত নৌকা যেমন চলিতে সক্ষম না হইয়া বিপথে গমন করিয়া বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ স্বামীর সাহায্য ব্যতীত এই অনন্ত সংসার-সমুদ্রে স্ত্রী-জীবন দিশাহারা হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে কষ্ট বোধ করে। অতএব স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হইতেই হইবে।

সংসারে পত্নীর দায়িত্ব অতি গুরুতর। কেবল মাত্র পতিকে যত্নপূর্ব্বক পান-ভোজন করাইলে, রোগের সময় তাঁহার শুশ্রূষা করিলে ও অন্যরূপে তাঁহার সুখস্বাস্থ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই যে স্ত্রীর উপযুক্ত পতি-সেবা হইল, সহ-ধর্ম্মিণীর কার্য্য হইল তাহা নহে। উহা আংশিক পতিসেবা বলা যাইতে পারে। পতিপরায়ণা হইতে হইলে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত পতিসেবা তো চাই-ই, তদ্ব্যতীত পত্নীকে স্বামীর ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবে। যে-নারী উল্লিখিত কার্য্যসকলের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিয়া পতির আত্মার কল্যাণসাধন করেন, তিনিই প্রকৃত পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী; তাঁহা দ্বারা যথার্থ পতিসেবা হয়। পতি শরীর নহে, শরীরস্থ আত্মা। অনেক ভোগসুখপরায়ণা নারী স্বামীর শরীরের প্রতি আসক্ত, তাঁহার শরীর লইয়াই দিবা-রাত্রি ব্যস্ত। স্বামীকে ঈশ্বরবিমুখ ধর্ম্মভ্রষ্ট নীতি-বিহীন দেখিয়াও সে-স্ত্রীর মনে ক্লেশ হয় না; তাঁহাকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য যিনি যত্ন করেন না, সেই স্ত্রীকে কেমন করিয়া পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী বলা যায়? পতির সঙ্গে যিনি নীচ পাশব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক দিব্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন তিনিই যথার্থ;

তিনিই সতী পুণ্যবতী। তিনি নিজের জীবনের সদৃষ্টান্তে, ন্যায়ের তীক্ষ্ণ শাসনে, প্রেমের আকর্ষণে, বিনয়-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সদুপদেশে তাঁহাকে ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করেন। স্ত্রীর উচ্চ ধর্ম্মভাব ও প্রাণগত যত্ন-চেষ্টা ও ব্যাকুলতায় পত্নীর ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তিনি উচ্চ জীবন লাভ করেন। ইহাকে বলে প্রকৃত পতিসেবা ও পাতিব্রত্য।

সতী পুণ্যবতী নারী সংসারের শ্রী, গৃহের লক্ষ্মী, ধর্ম্মের প্রকৃত সঙ্গিনী, স্বামীর যথার্থ সহ-চরী ও বন্ধু। ইঁহার সহবাসে গৃহ পুণ্যধাম হয়, সংসার মধুময় হয়, সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠিত হয়, গৃহে শান্তি বিরাজ করে। প্রকৃত সতীত্ব নারীজাতির দেবদুর্ল্লভ অলঙ্কার; জীবন-সংগ্রামে ইহা তাঁহাদের অভেদ্য কবচ, পরিবার-মধ্যে ইহা স্বর্গীয় কৌস্তুভমণি, ধর্ম্মজীবনে ইহা অদ্বিতীয় সহায়, জন-সমাজে ইহা পবিত্র আদর্শ। সতীত্ব জন-সমাজের মেরুদণ্ড, সতীত্ব সামাজিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি। সতী জননীর ন্যায় বাৎসল্য-পরায়ণা, সখীর ন্যায় হিতৈষিণী ও সৎপরামর্শদাত্রী, কন্যার ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা-নিরতা। তিনি পতিসেবার জন্য যে-সময়ে যেরূপ প্রয়োজন, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি সেই বেশ পরিগ্রহ করেন।

পতিসেবা নারীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। জনক-দুহিতা সীতা অতুল ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ে পালিতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়াছিলেন। রাজদুহিতা জানকী শ্বাপদসঙ্কুল বন অপেক্ষা রাজান্তঃপুরই কষ্টকর স্থান জ্ঞান করিয়া মনের আনন্দে স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়া কুচক্রী সংসারের কঠোর নিষ্পীড়নে কত কষ্টই ভোগ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি স্বামীসেবা হইতে বিচ্যুতা হন নাই। দক্ষকন্যা সতী পিতার সন্নিধানে স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা স্বামীকে বিশ্বামিত্রের ঋণ হইতে পরিমুক্ত করিবার জন্য আপনাকে বিক্রয় করিতে স্বামীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিপদকালে তিনি পিতৃ-গৃহে না যাইয়া স্বামীর সহিত থাকিতেও সুখ বোধ করিয়া-ছিলেন এবং স্বীয় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত থাকিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। চিতোরের রাণী পদ্মিনী স্বীয় স্বামী ভীমসিংহকে দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিনের হস্ত হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা বেহুলা সর্পদষ্ট মৃত স্বামীর বিগলিত শরীর সঙ্গে লইয়া সামান্য ভেলাতে অকূল সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। সাবিত্রী সত্য-বানের জন্য মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক স্বামীর প্রাণভিক্ষা লইয়াছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত সতী রমণীগণের নাম এখনো পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিনী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, অগস্ত্যের লোপামুদ্রা, চ্যবণের সুকন্যা, কপিলের শ্রীমতী, ইন্দ্রের শচী, সগরের কেশিনী, সৌদাসের দময়ন্তী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, এবং নারায়ণের লক্ষ্মী পতিব্রতা ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। সতীত্বের গৌরব বুঝিত বলিয়াই রমণী-সম্মান, রমণী-মাহাত্ম্য এক-মাত্র ভারতবর্ষেই উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়াছে। স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ—যেখানেই অন্বেষণ করিবে, সেইখানেই দেখিতে পাইবে—স্ত্রী-জাতির সম্মান, পত্নীর আদর, সাধ্বীর মাহাত্ম্য। সেইখানেই দেখিবে, নারী-হেলায় নিন্দা, পত্নী-অনাদরের কুৎসা, কুলবধূ সন্তাপের বিষময় ফল। তাই এত অধঃপতন-কালেও হিন্দুর ঘরে এই গৃহদেবতা লক্ষ্মীরূপিণী রমণী আদর-গৌরব কমে নাই। এখনো হিন্দু বুঝে, হিন্দু ভাবে,

সাধ্বী রমণী স্বর্গের সৃষ্টি, লক্ষীর মূর্ত্তি, দেবীর প্রতিমা। তাই যে-শক্তি ধনধান্যদায়িনী সংসার শ্রীবর্দ্ধিনী, তাহা লক্ষীরূপে,—যে-শক্তি বিপদ-নাশিনী, শত্রু-দলনী, কালভয়নিবারিণী, তাহা কালীরূপে—যে-শক্তি জ্ঞান-প্রসবিনী, জ্ঞানদায়িনী, তাহা সরস্বতীরূপে —যে-শক্তি সর্ব্বভূত বিশ্ব-প্রসবিনী, বিশ্বজননী, তাহাই আদ্যাশক্তি-ভগবতী-রূপে এ-দেশে পূজিত। ইহা অপেক্ষা রমণী-গৌরব ও রমণী-মাহাত্ম্যের উচ্চতা ও প্রবলতা আর কোথায় দৃষ্ট হয়?

মানব-সমাজ উন্নত করিতে হইলে স্ত্রীগণকে পতিব্রতা হইতেই হইবে। স্ত্রীজাতি সমাজের আকর্ষণ-দণ্ড। সদাচার ইহার মূল, ভক্তিই ইহার অঙ্গ, পরোপকার ইহার শীর্ষ দেশ এবং আত্মত্যাগ ইহার আকর্ষণশক্তি। যতদিন এই কয়েকটি উপাদান অটুট থাকিবে ততদিন শক্তি অক্ষুণ্ণ ও সমাজ অটল থাকিবে। ততদিন শত সহস্র রাজনৈতিক বিপ্লব দেশকে আলোড়িত করিলেও সমাজকে তিলমাত্র কম্পিত করিতে পারিবে না। আজো হিন্দুর পবিত্র দাম্পত্য প্রণয় জগৎকে স্পর্দ্ধা করিতেছে;—আজো হিন্দু মহিলার দেবভক্তি, গুরুভক্তি, পতিভক্তি, জগতে স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তির প্রভাবেই হিন্দুর প্রাচীন গরিমা আজো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের মহিলাগণ প্রায়ই প্রকৃত পাতি-ব্রত্যের ধার ধারেন না। গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাস্তবিক পতিকে প্রণয় করেন না। তাঁহারা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিলাস-বস্তুর প্রকৃত প্রণয়িনী; পতি-প্রণয়িনী নহেন। যে-পতি অর্থশালী, উপার্জ্জন-শীল, পত্নীর আজ্ঞামত বিলাসবস্তুসকল প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এখন পত্নীর প্রণয়-ভাজন। যদি তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন তবে তিনি স্ত্রীর প্রণয়-অধিকারী নহেন। যে-স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ উপাদেয় পদার্থ প্রদান করিত, তাঁহার সামান্য পীড়া হইলে তাঁহার অসুখের সীমা-পরিসীমা থাকিত না, অর্থাগমের অভাব-প্রযুক্ত ঘোর দরিদ্র-দশা উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রী সেই পতিকে সহস্র কটুবাক্য না বলিয়া শাকান্নও প্রদান করে না। অনেক দুর্ভাগ্য পুরুষ এই অবস্থায় প্রত্যেক অন্নগ্রাস অশ্রুপাতের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে কি আমরা পতিপ্রেম বলিব? যে বিলাসবস্তুকে প্রণয় করে আমরা তাহাকে পতিব্রতা বলি না। বিলাস-প্রণয়িনী এবং বারাঙ্গণাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

যেসকল মহিলা অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিকে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে নিষেধ করি না, কারণ যে-নারীর সৌন্দর্য্য নাই তাহার কিছুই নাই। সৌন্দর্য্যরক্ষা ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি বিষয়ে অবহেলা করা পাপ; কিন্তু আমরা এই মাত্র তাঁহাদিগকে বলিতে চাহি যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে, উহা অসারের অসার; দুই দিন পরে উহা জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্ন হইবে, শতযত্নেও উহাকে অক্ষয় রাখিতে পারিবে না। কৃত্রিমতা যত কম হইবে ততই স্বভাবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। একটি সতী নারীর পবিত্রতা লজ্জা বিনয়ের নিকটে অন্য নারীর হীরা-মুক্তা-খচিত আভরণের কিছুমাত্র মূল্য নাই। সতীত্ব-ভূষণে যিনি ভূষিতা, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। স্বার্থত্যাগে, বিলাসবাসনা বর্জ্জনে, ঈশ্বরোপাসনায়, প্রেম ও পবিত্রতায়, পরসেবায়, চিত্ত-সংযমে, জিতেন্দ্রিয়তায় ও দয়াদাক্ষিণ্যে সেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। জরা-বার্দ্ধক্যে সেই সৌন্দর্য্যের বিনাশ হয় না, মৃত্যুতেও সেই সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় না।

যাহাতে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ না হইতে পারে

তদ্বিষয়ে নারীগণের মনোযোগী হওয়া উচিত। স্ত্রী-পুরুষের কলহ অমানুষোচিত বিগর্হিত কার্য্য। পত্নী পতিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন, সকল ব্যাপারে তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিবেন, তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখিলে ক্ষমা করিবেন। পতিও পত্নীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতিসম্পন্ন হইবেন, তাঁহার অপরাধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিচয় দিবেন, ইহাই স্বর্গীয় বিধি। মানগর্ব্বিত হইয়া প্রেমের ঝগড়ায় গালি তিরস্কার, লাঠালাঠি আসুরিক ভাব। যদি কখনো কলহ সংঘটন হয়, তবে তোমাদিগের শুভ পরিণয়-দিনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ো। তাহা হইলে তোমাদের মনোমালিন্য তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। বিবাহ-দিনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, উভয়ে উভয়ের জীবন-পথের সঙ্গী ও সঙ্গিনী হইবে। বিবাহ-বাসরে স্বামী ও স্ত্রী কত সুখের কল্পনা মানস-পটে চিত্রিত করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন, স্বামীর মনে কত আশা, তাঁহার এই নব-পরিণীতা ভার্য্যা কালে সুগৃহিণী হইয়া তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিবে, তাঁহার গৃহ প্রীতি ও পবিত্রতার আধার হইয়া তাঁহাদিগের দাম্পত্য-জীবন কত সুখময় করিয়া তুলিবে, হিংসা-দ্বেষরূপ বিষবহ্নি তাঁহাদের সুখাগারে প্রবেশ করিয়া তাহা কলুষিত করিতে পারিবে না, সেখানে কেবলই চিরশান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা অনভিজ্ঞতার দোষে স্বামীর সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিপরীত ব্যবহার করিয়া সংসার অশান্তিময় করিয়া তুল, তবে তাহা কি দুঃখের বিষয় নহে? উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া যে-আশা-প্রদীপের উজ্জ্বলালোকে সংসারে আপনাদের জীবনের পথ অতি সুখকর ও অতি সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন, স্ত্রীগণ আপনাদের ব্যবহার দোষে মনোমালিন্যরূপ মহাবাত্যা সৃজনপূর্ব্বক আপনাদের সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশা-প্রদীপকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়ো না। রমণী চেষ্টা করিলে গৃহকে স্বর্গতুল্য করিতে পারেন, আবার স্বভাবদোষে তাহা নরকেও পরিণত করিতে পারেন। যে-গৃহে রমণী-কণ্ঠ হইতে অনবরত কর্কশ বাক্য নির্গত হইতেছে, যে-গৃহ কলহ ও অশান্তির চির-আবাস তাহাকে মূর্ত্তিমান নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর একদিকে, যে-গৃহে রমণী নিজ সদ্‌গুণরাশি দ্বারা মধুরতা ও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন, যে-গৃহ হইতে নিয়ত আনন্দ-রোল উত্থিত হইতেছে, অশান্তি ও কলহ যে-গৃহ হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গ বলিব না তো পৃথিবীতে আর স্বর্গের ছবি কোথায়? অনেক স্থলে পুরুষের কঠোর ব্যবহারে ও পুরুষের অবিবেচনায় গৃহের শান্তিভঙ্গ হয় স্বীকার করি; কিন্তু সে-গৃহের রমণী যদি স্নেহশীলা ধৈর্য্যশালা হন, তবে সে অশান্তি কত দিন থাকে? আমি একথা বলি না যে, পরিবার-মধ্যে পুরুষের কোনো দায়িত্ব কোনো কর্ত্তব্য নাই। তাঁহারও গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। পুরুষ রমণীকে শ্রদ্ধা করিবেন, রমণীও পুরুষকে শ্রদ্ধা করিবেন। স্ত্রী ও পুরুষ দ্বারা সংসার গঠিত। পুরুষ-প্রকৃতি কঠোর, স্ত্রী কোমলতার আধার। এই কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণ অতি মধুর। কেবল কঠোর অথবা কোমলে সংসার চলিতে পারে না, তাই বিধাতা তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে দুইটি প্রাণ একত্র করিয়া একের অভাব অন্যটিদ্বারা পূরণ করিয়াছেন। তাই একের অভাবে অন্যটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই একজন গরম হইলে অন্যজনের নরম হওয়া চাই। নতুবা কলহ বাড়িয়া যাইবে।

স্বামী যদি কোনো ঘটনাচক্রে দাম্পত্য প্রেমের সরস রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়া কর্দ্দমময় সংসারে নিপতিত হয়, তবে বিদুষী জ্ঞানবতী উন্নতমনা সাধ্বী স্ত্রী সদা হাসি-হাসি-মুখে, মধুর সম্ভাষণে তাহাকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা

করিবেন। রাগে বিবাদে ও অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকিলে কোনো সুফল ফলিবে না বরং কুফলের সম্ভাবনা। অথবা স্বামীকে পরদাররত দেখিয়া নিজে পতিব্রতার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিবে না, বরং স্বামীর অধীন থাকিয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। পত্নী যদি মনে প্রাণে পতির সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে, তবে পতিও তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বশ হইয়া যাইবে। কারণ সদ্‌গুণের ন্যায় আকর্ষণকারী বস্তু পৃথিবীতে অতি বিরল। কিন্তু পত্নী যদি বিবাদ, রাগ, দ্বেষ ও কটুকর্কশ ভাষায় পূর্ণ হয়, তবে পতির অভিরুচি তাহার উপর হইতে অপসারিত হইয়া পরস্ত্রীতে ঘনীভূত হইতে পারে এবং যে অর্থ স্ত্রী বা তাহার সন্তান-সন্ততির সুখের জন্য সংগৃহীত হইত, তাহা না হইয়া পরের জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং তাহাতে স্ত্রী বা তাহার সন্তানাদির ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সদ্ভাব রাখে তবে সে-ধন আর অযথা খরচ হইতে পারে না—ইহা বড় অল্প লাভের বিষয় নহে।

সংসারে চরিত্রগঠনে নারী প্রধান সহায়। শৈশবে মাতা ও যৌবনে স্ত্রী-চরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। পুরুষ স্ত্রীর স্নেহ কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং আত্ম-সমর্পণ করে। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আনন্দে সুশোভিত রমণী পতির গৌরব ও স্বর্গের দেবীতুল্যা। যে-গৃহে গৃহিণী ধর্ম্ম-বিরোধিনী, উগ্রপ্রকৃতি, কলহ-প্রিয়া, নীচাশয়া, সেই গৃহ হইতে সুখ-শান্তি বহু দূরে পলায়ন করে। সেই স্থান পাপের আবাস হইয়া থাকে। এইজন্য স্ত্রীগণকে মিষ্টভাষিণী হইতে হইবে। বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া স্বামীর নয়নমুগ্ধকর আপাতরম্য পুতুল না হইয়া তাঁহার হৃদয়মোহিনী দেবী হইতে হইবে। পতির নয়নের উপর রাজত্ব না করিয়া স্নেহ কোমলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে হইবে।

কখনো গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়ো না। স্মরণ রাখিয়ো যে, পরমেশ্বর স্ত্রী-জীবন স্নেহ, প্রেম, দয়া, বদান্যতা, প্রীতি ও ক্ষমা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার কোনো একটির অভাব ঘটিলে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক সংসারের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী; তাঁহাদের নিজ জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া চলা উচিত। রমণী সুগৃহিণী হইয়া প্রিয়জনের সকল অবস্থার সহায় হইবেন। পরিবারের কর্ত্রীর শাসন ও কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হইবে; সম্মানের আসন চির অচল থাকিবে; অথচ কোমল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ, প্রীতি-বিস্ফারিত আনন, সস্নেহ সম্ভাষণ, মধুর বচন, শ্রান্ত জনের আনন্দ-বিধায়ক হইয়া প্রতি জনকে আকৃষ্ট করিবে। সকল হৃদয় সেই শীতল ছায়ায় আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য চিরদিন উৎসুক থাকিবে। যেসকল স্ত্রী, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বন্ধু হইতে স্বামীর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়, যাহারা নানাপ্রকার কুহক দ্বারা স্বামীর মনে তাঁহার পিতা, মাতা, সহোদর, সহোদরা এবং অন্যান্য বন্ধুদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অনাদর জন্মাইয়া দেয় কাল তাহারা কখনই অন্তরঙ্গ নহে; তাহারা ভুজঙ্গিনী। পক্ষান্তরে যেসকল স্ত্রী আপনা-দিগের স্বামীর হৃদয়কে দয়ার্দ্র এবং কোমল করিয়া পরসেবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন, তাঁহারাই যথার্থ সতী। তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই সকলের শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র।

স্বামী প্রবাসে গেলে রমণী পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের অধীনে অবস্থান করিবেন। ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ,

আমোদ প্রমোদে যোগদান ইত্যাদি তাঁহার সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য; নতুবা প্রণষ্টচরিত্র পুরুষের মন স্ত্রীলোকের উপর আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমার্গ হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে। যুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গে তাহার থাকা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাদিগের হাস্য-পরিহাসে মানসিক বিকৃতি হওয়া সম্ভব ও তজ্জনিত ভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাদিগের সহবাস প্রবাসগত-ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষে প্রশস্ত। গৃহ কার্য্য শিল্পকার্য্য, সন্তান-পালন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার কালাতিপাত করা উচিত।

বিধবা রমণীগণের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্মকার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়, বিশ্বাস ও আত্মার পরিচয় দেয় তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপভাবে পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়-জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব অতি পবিত্র। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য, এ বিষয়টি সকলেরই শিক্ষা করা উচিত। শাস্ত্রীয় পুস্তক পাঠে মন কতকটা শান্ত হইতে পারে। নাটক নভেল বিধবাদিগের পক্ষে বিষ। প্রবাসগত স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে যে-যে বিষয়ের বিধান আছে, বিধবারও তাহা পালন করা কর্ত্তব্য।

রমণীগণের পরনিন্দা ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিজের গৃহস্থিত ব্যক্তিরই হউক বা প্রতিবেশীরই হউক কখনো নিন্দা করিবে না। পরনিন্দার ন্যায় গুরুতর পাপ আর নাই। মক্ষিকা যেমন ক্ষত পুঁজরক্ত অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, নিন্দুকেরা তদ্রূপ কোথায় একটু দোষ ও ছিদ্র পাইবে তাহাই মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করে। বিন্দুমাত্র দোষ পাইলে তাহারা তাহাকে নিজগুণে বড় করিয়া তুলে। ইহাতে যেমন নিজের ক্ষতি তেমনি পরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং নিন্দার কালী মুখে মাখিয়া শ্রীহীন হইয়ো না; নিন্দার কলঙ্কে হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়ো না। ঈশ্বর যে তোমাকে কোমল রসনা দিয়াছেন, তাহা সদালাপ ও লোকের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য; কটূক্তি ও নিন্দা করিয়া জগতের অপকার করিবার জন্য নহে। লোকের গুণকীর্ত্তন করিয়া রসনাকে সার্থক কর; মানীর মান বাড়াইয়া নিজে মানী হও। ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া গুণান্বেষণ কর। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তুমিও সকল লোকের গুণ গ্রহণ কর। শূন্যগর্ভ অসার লোকেরা বিদ্বেষ-বশতই পরনিন্দা করিয়া থাকে।

রমণীগণ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং গৃহকর্ম্মও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাসময়ে নির্ব্বাহিত হইবে। রমণীগণ যদি অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, তবে গৃহের কার্য্যাদি অতি বিলম্বে সম্পাদিত হইবে। যাহারা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত থাকে, রোগ তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করে। বিলম্বে গৃহের কর্ম্মারম্ভ করিলে বিশ্রামের অবসরও পাওয়া যায় না। ইহা রমণীদিগের পক্ষে অন্য একটি অসুবিধা। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা রমণীদিগের একটি বিশেষ কার্য্য; শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা রক্ষার জন্য একার্য্য করিতেই হইবে। শারীরিক কার্য্য যথোচিত সম্পাদিত না হইলে স্বাস্থ্যসম্পদের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা মনও উত্তেজিত হয়, কেন না প্রধানত মানসিক উত্তেজনা-দ্বারাই ইচ্ছামত পেশীসকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এবং পরে শারীরিক কার্য্যসকল তদ্দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়াতে শরীরের পুষ্টি যেমন হয়, মনেরও তেমনি উৎসাহ ও আনন্দ হয়।

ভোজন প্রস্তুত হইলে প্রথমে বালক-বালিকা ও রোগী তৎপরে বৃদ্ধগণকে ভোজন করাইবে। অতঃপর গর্ভিণী স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, অতিথি, স্বামী ও ভৃত্যকে ক্রমানুসারে ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অলঙ্কারাদি ঠিক ঠিক শরীরে আছে কি না দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিবে। নতুবা যদি তাহা ভৃত্যাদির হস্তে আইসে, তাহা হইলে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি একান্ত দুর্ঘট।

যদি কেহ কখনো তোমাকে কোনো বিষয়ে উপদেশ দেন তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়ো না। সে উপদেশ তোমার মনোমত হউক বা না হউক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে একদিকে তোমার শিষ্টতা দেখানো হইল ও অন্যদিকে উপদেষ্টাও আনন্দিত হইলেন।

মিতব্যয়িতা রমণীগণের একটি প্রধান ধর্ম্ম। তাহা না থাকিলে পদে-পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোনো ক্ষতি নাই, পরন্তু ব্যয় যদি আয় অপেক্ষা অধিক হয় তবে ঋণগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সহিতে হয়। এ বিষয়টি গৃহিণী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রম রমণীগণের জানা উচিত যে, মিত্র সত্তা দ্বারা, শত্রু শীলতা দ্বারা, কৃপণ ধনদ্বারা, গুরুজন সেবা দ্বারা, বয়োকনিষ্ঠগণ ক্ষমা দ্বারা, বিদ্বানগণ বিনয় দ্বারা, মূর্খ মিষ্ট কথা দ্বারা, পুরুষ সেবা দ্বারা, অভিমানী প্রশংসা দ্বারা, ক্রোধী শান্তভাব দ্বারা, আত্মীয় বন্ধুগণ স্নেহ দ্বারা, পরজন উপকার দ্বারা, প্রতিবেশী দয়া দ্বারা, সংসার মিত্রভাব দ্বারা এবং স্বামী ভক্তি দ্বারা বশ হইয়া থাকেন।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

প্রতিজ্ঞা-পালন

(গল্প)

সরলা সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূ। সরলার পিত্রালয় গোবিন্দপুর। সরলার পিতা একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

একদিন সরলার সকলই ছিল। পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ, পতির অকৃত্রিম প্রেম, আত্মীয় স্বজনের অগাধ ভালবাসা, একদিন সে এ সমস্তই উপভোগ করিয়াছিল।

সরলার স্বামী একজন অতি সচ্চরিত্র এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র যুবক আজকাল খুব কমই দৃষ্ট হয়।

কিন্তু কালের গম্ভীরতম অন্ধকার-গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? হতভাগিনী সরলার কপাল ভাঙিল, এ জগতে তাহার সুখের দিন ফুরাইল। তাহার স্বামী অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। সরলা একমাত্র শিশু-পুত্র লইয়া সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিল। বঙ্গ-বিধবাদের যে কি কষ্ট, কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবে না।

জানি না কোন্ মহাপাপের ফলে বাংলায় রমণীজন্ম হয়। আমাদের সরলাও এই বাঙালীর গৃহে রমণী-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল; সুতরাং তাহাকেও যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে-সকল দুঃখ-কাহিনী এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে সুখে-দুঃখে—লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিয়া সংসারের শত অত্যাচারের ভিতর দিয়া সরলার বৈধব্য-জীবনের সুদীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষ অতিক্রম হইয়া গিয়াছে। কত দুঃখে কত কষ্টে—সে তাহার অন্ধের-যষ্টি নয়নের-মণি শিশু সন্তানটিকে

মানুষ করিয়াছে। কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে কত বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া অদৃষ্টের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিয়া তাহার সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর কাটিয়াছে।

তাহার শিশু-পুত্র নলিনী এখন শৈশব কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। নলিনী প্রশংসার সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দুইশত টাকা বেতনে রাজসরকারে ডেপুটীর কার্য্য পাইয়াছে।

অবস্থা কাহারো চিরদিন সমানভাবে থাকে না। তাই দেখাইবার জন্যই বোধ হয় দয়াময় জগদীশ্বর সরলাকে বহুদিন যাবত দুঃখের যন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া আজ তাহার প্রতি এই করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

নলিনী কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া কটকে বদলী হইয়া গেল। সরলাও পুত্রের সহিত কটকে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নদী-তীরে নলিনী একটি সুন্দর সুদৃশ্য বাসা ভাড়া লইয়া মাতা-পুত্রে তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। অবস্থার বিপর্য্যয়-হেতু সরলা এতদিন পুত্রের বিবাহ দেয় নাই, কিন্তু এখন আর সে বিঘ্ন নাই। ভগবানের অপার মহিমায় নলিনী আজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-ভূষণে বিভূষিত উচ্চরাজকর্ম্মচারী।

সরলা এখন পুত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন পাত্রের বিবাহের জন্য ভাবিতে হয় না, বিনা চেষ্টাতেই কন্যাদায়গ্রস্ত উমেদার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

কার্য্যোপলক্ষে বিস্তর বাঙালী কটকে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারও অভাব নাই। নলিনীকে অবিবাহিত জানিয়া বহু ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা নলিনার মাতার কাছে দর বলিয়া পাঠাইতে লাগিল; আর যাহাদের অর্থ নাই তাহারা "ছেলের বাজার চড়া" এমন ছেলের কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না বলিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; এবং স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। যাহা হউক অনেক দেখা-শুনার পরে স্থানীয় সিবিল-সার্জ্জন আর, এম বসুর কন্যা প্রতিভার সঙ্গে সরলা স্বীয় পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। মিঃ বসু কন্যাকে চারি হাজার টাকার গহনা এবং জামাতাকে নগদ তিন হাজার টাকা যৌতুক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

মেয়েটিও দেখতে-শুনতে মন্দ নয়,—শিক্ষিতা। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া সরলা নলিনীকে সমস্ত জ্ঞাত করাইল। নলিনী তাহাতে অমত হইল না। বলিতে-কি নলিনীও প্রতিভাকে ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছিল। তাহার মনোনীতও হইয়াছিল।

ডাক্তারবাবুর বাসা এবং নলিনীর বাসা ঠিক পাশাপাশি। উভয় বাটীর ছাদে উঠিলে পরস্পর বেশ দেখা-শুনা যাইত। প্রতিভা প্রায়ই ছাদে বেড়াইয়া বেড়াইত; কিম্বা ছাদে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত, কি উল ইত্যাদি লইয়া বুনিত, তাই নলিনী তাহাকে দেখিয়াছিল।

প্রতিভার সঙ্গে নলিনীর বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। শুভ দিন দেখিয়া পাত্র ও পাত্রীর পাকা দেখা—আশীর্ব্বাদ হইল। ডাক্তার-বাবু নলিনীকে হীরকাঙ্গুরীয় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরলা প্রতিভাকে মুক্তার মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

৩

নলিনীর বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত। উভয় পক্ষই বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। ডাক্তারবাবু খুব ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিবেন। আর ভগবৎকৃপায় সরলারও এখন সুসময়, সেই-বা কেন আড়ম্বরশূন্য রাখিবে? উভয় পক্ষেরই আত্মীয় বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-বাটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। হাস্য-কৌতুকের

কলধ্বনি এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে বাটী পরিপূর্ণ!

বিবাহের আর তিন দিবস মাত্র বিলম্ব আছে। এমন সময় একদিন সরলারই সমবয়স্কা একজন বিধবা অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না একটি বালিকাকে সঙ্গে লইয়া সরলার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সরলা বড়ই আনন্দিতা হইল।

সরলা সহর্ষে রমণীকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এতদিন কোথায় ছিলে ভাই বেয়ান।" আগন্তুক রমণী সরলার বাল্যকালের পাতানো বেয়ান। সরলা বলিল, "তোমায় দেখে বড় সুখী হয়েছি, যদি এসেছ তাহলে এখন আর তোমায় যেতে দেবো না।"

রমণী একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "বেয়ান, অল্প বয়েসে বিধবা হওয়ার যে কি কষ্ট তা'তো তুমি জানো ভাই!" তৎপরে সেই সুন্দরী বালিকাটিকে দেখাইয়া বলিল, "এই মেয়ে যখন চার বছরের, তখন আমি বিধবা হই,—আমার স্বামী সামান্য চাকরি করতেন, আমাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, তা বোধ হয় তুমি শুনে থাকবে ভাই। তাঁর মৃত্যুর পরে পেটের ভাতের জন্যে এই মেয়ে নিয়ে কত আত্মীয় কুটুম্বের কাছে গিয়েছি, কত লাঞ্ছনা, কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি; তারপর এই মেয়ে বে'র যুগ্যি হয়েছে, পয়সার অভাবে এর বিয়ে দিতে পারি নি। আর আমার এমন কেউ আত্মীয় নেই যে, পয়সা খরচ করে' এই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। তাই নিরুপায়ে পড়ে' কত খুঁজে-খুঁজে কত লোকের কাছে সন্ধান নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার ছেলেবেলাকার একটি কথা মনে করে' বড় আশা করে' তোমার কাছে এসেছি—আমায় রক্ষা কর।"

সরলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কি কি? আমায় কি করতে হবে বল। আমার সাধ্য হয় তো, আমাকে যা বলবে তাই করব, আমি প্রতিজ্ঞা করচি।"

রমণী বলিল, "ভাই যখন ছেলেবেলায় আমরা বেয়ান পাতিয়েছিলুম, তখন তুমি সত্য করে-ছিলে, আমাদের ছেলে-মেয়ে হ'লে পরস্পর তাদের বে' দিয়ে আমাদের এ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখবে, তা তারা যেমনই কেন হোক না। ভগবানের কৃপায় তোমার একটি পুত্র, পরে আমার একটি কন্যা হয়েছে; তারপর আমরা দুজনেই বিধবা হয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। করুণাময়ের অপার করুণায় তুমি সংসার-যুদ্ধে জয়ী হয়েছ; তোমার ছেলে আজ দশজনের কাছে গণ্য-মান্য হয়ে উঠেছে—জানি, তোমার ছেলের সঙ্গে এখন আমার মেয়ের বিয়ের কথা বলা, আমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার বাসনার মত। কিন্তু তুমি যদি নিজগুণে তোমার সে সত্য-পালন কর, তা হলেই আমি এ-দায় থেকে বাঁচি। আর ভাই এখনো তুমি প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তোমার সাধ্য হয়, তবে আমি যা' বলব তাই করবে। লীলা আমার নীচ বংশোদ্ভবা নয় তাতো জান।"

সরলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অপরে হয় তো এ কথা শুনিলে বিদ্রূপের হাসি হাসিত, কিন্তু সরলা সে-প্রকৃতির লোক নহে। একদিন তাহারও অদৃষ্ট নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল। তাই সে অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়। তাই সে ব্যথিতের বেদনা অনুভব করিতে পারে। কিছু পরে সরলা বলিল, "তা' ভাই, এতদিন কেন এস নি? এখন যে ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার নলিনীর বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে। আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, এখন আর কি করে' হয়?"

আগন্তুক রমণী বড় কাতরে সরলার হাত দুখানি দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া বড় করুণ, বড় মর্ম্মভেদীস্বরে বলিল,—"এ সংসারে আমার

এমন কেউ নেই যে, আমায় এ কন্যাদায় হতে উদ্ধার করে। নিষ্ঠুর দেশে অর্থ না পেলে কেউ মেয়েকে বিয়ে করবে না, আমি বড় আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমায় আশায় নিরাশ কোরো না। আমার লীলাকে তোমায় দিলুম, তুমি যা ভাল হয় কর।" এই বলিয়া রমণী কন্যার পুষ্পনিভ করকমলখানি সরলার হাতের উপর তুলিয়া দিল।

বুঝি সে সুধাস্পর্শে সরলার প্রাণ টলিল! আর সেই অনিন্দনীয় রূপরাশি দর্শনে বুঝি সরলার মনের ভিতর আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল! সরলা সযত্নে বালিকার হাতখানি ধরিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

৪

তখন বেলা সাড়েদশটা বাজিয়া গিয়াছে। নলিনী আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কাছারী যাইবার নিমিত্ত হ্যাটকোট পরিয়া সু-সজ্জিত হইতেছিল। আরদালী চাপরাশ আঁটিয়া সরকারী বাক্স বহিবার জন্য বিনীতভাবে দ্বারের পার্শ্বে প্রভুর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল।

এমন সময় সরলা লীলার হাত ধরিয়া সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনীকে বলিল, "বাবা নলিন্, তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে—"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কবে তোমার কোন্ কথাটা শুনি নি মা?"

সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "জানি বাবা তা তুমি আমার সু-সন্তান, তাই সাহস করে তোমার সকল কথা বলতে পারি, নইলে—"

নলিনী সহাস্যে বাধা দিয়া বলিল, "এখন কথাটা কি বলে' ফেল মা। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। এ মেয়েটি কে?" এই বলিয়া নলিনী লীলার দিকে চাহিল। লজ্জায় লীলার আয়ত নয়নদুটি নত হইয়া পড়িল। সরলা বলিল, "এরি কথা বলবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার যে-বিয়ের কথা ঠিক করেছিলুম, তা' হবে না, তাঁর আশীর্ব্বাদী আংটিটি ফেরত দিতে হবে। এই মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

এই বলিয়া সরলা পুত্রের নিকট সকল কথা বিবৃত করিল। নলিনী সকল শুনিয়া বলিল, "তা' এ-সকল কথার আমি কি জানি? তুমি যা' করবে তাই হবে।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবুর প্রদত্ত নূতন প্রাপ্ত হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া মাতার হস্তে অর্পণ করিল; আর অলক্ষ্যে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া লইল! লীলার সেই সরলতা-মাখা আনত বদন-মণ্ডল, সেই সূক্ষ্ম সুকৃষ্ণ সুবঙ্কিম ভ্রূযুগের নীচে ঢল-ঢল ছল-ছল চক্ষুদুটিতে বুঝি নলিনীর হৃদয় আকৃষ্ট হইল।

নলিনী প্রফুল্লমনে কাছারি চলিয়া গেল।

সরলা ডাক্তারবাবুর অঙ্গুরীয় ফেরত পাঠাইল। এবং লোকদ্বারা পত্র লিখিয়া দিল যে, এ-বিবাহ হইবে না।

ডাক্তারবাবু সেই সময় হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন মাত্র। হ্যাট্‌কোট খুলিয়া রাখিয়া প্রিস্ক্রিপশনের ফর্দ্দ দেখিতেছিলেন, তখনো তাঁহার পেণ্টুলেন-পরা ও গ্যালিস আঁটা ছিল।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সরলার প্রদত্ত পত্র ও অঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া ডাক্তারবাবুর মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বিবাহ-ভঙ্গের কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি সেই অবস্থায়ই দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে সরলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং সরলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সরলা অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সকল কথা বলিল।

নলিনীর ন্যায় জামাতা লাভ করা লোকে পরম সৌভাগ্য মনে করে। ডাক্তারবাবুও সহজে

...পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ...এ বিবাহ সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সরলাকে ...অনুরোধ, উপরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি আরো দুই এক হাজার টাকা বেশী দিতে চাহিলেন। কিন্তু সরলা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ...স্বীকৃত হইল না। এবং অতি বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়, মাপ করবেন, আমাকে আর অর্থলোভ দেখাবেন না। আপনি ...এবং ধনবান, এ সংসারে আপনার ন্যায় ব্যক্তির কন্যার বিবাহের কোনো চিন্তা নেই। অর্থদ্বারা আপনি অনেক সৎপাত্র ক্রয় করতে পারবেন। কিন্তু এই অসহায় বিধবা ...অর্থাভাবে এমন সুন্দরী কন্যারও বিবাহ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। আর আমিও বাল্যকালে প্রতিশ্রুত ছিলুম যে, আমাদের পুত্রকন্যা হলে ...তাদের বিবাহ দেবো, সেই ভরসায় ইনি ...উৎপীড়িত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। ...আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোরবো।"

অগত্যা ডাক্তারবাবু ক্ষুন্নমনে চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে সরলার মুক্তার মালা ফেরত দিলেন।

সরলার প্রকৃতি দেখিয়া ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেমন করিয়া সরলা এত টাকা এবং বড়লোক কুটুম্বের আশা ত্যাগ করিয়া একজন অসহায় কপর্দ্দকহীন বিধবার কন্যার সহিত স্বীয় উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিবে! সংসারে এমন মানুষ তো দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে লীলার সহিত নলিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। লীলার মাতা আশাতিরিক্ত সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনের আনন্দে কাশীবাসিনী হইলেন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

নিবেদন

তোমারি দেওয়া সুখ
তোমারি দেওয়া দুখ,
যখন যা দাও হরি,
পাতিয়া লইব বুক।

চির শুভময় তুমি
কিছুতে অশুভ নয়,
অসহ হলেও ব্যথা
লুকাইয়ে শুভ রয়।

যা সাধ তোমার যবে
হউক সফল তাই,
রহিতে অচল পদে
শুধু হে শকতি চাই।

তোমারি বিধান তলে
"মূক" করি দাও মোরে,
যেন না বিচার করি
কখনো মোহেতে পড়ে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

শীলা

(উপন্যাস)

"মহা মুস্কিলের কথা হল, কি কোরবো ?" গৃহিনী মেজাজ রুক্ষ করিয়া এই কথা বলিলেন। গৃহ-কর্ত্তা রামলোচন মিত্র কটকের কোনো প্রাইভেট ইস্কুলে হেড মাষ্টারের কার্য্য করেন। কাটজুড়ী নদীর ধারে তাঁর ক্ষুদ্র বাসাবাড়ী। গৃহিণীর কথা শুনিয়া তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন, "কি আর কোরবো বল, অভয়-দাদা যখন তাঁর মেয়েটির ভার আমায় দিয়ে গেছেন, তখন তাকে রাখতেই হবে।" অভয়াচরণ রামলোচনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি পশ্চিমে লক্ষ্ণৌতে কাজ করিতেন। সেই সময়ে তিনি সেই-দেশস্থ এক ব্রাহ্ম-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি সেই-স্থানেই বাস করিয়াছেন ও সেই-স্থানেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তিনি সেইখানে কোনো আপিসে কাজ করিতেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে যত-না লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য ও বেহালা বাজাইবার অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি সকলকার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। একটিমাত্র কন্যাকে অকালে মাতৃহীনা করিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত অভয়াচরণ নিজের জীবনের সকল সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিয়া এই কন্যার লালনপালনে যত্নবান ছিলেন। কন্যাটি বিবাহের বয়সে উপনীত হইলেও অদ্যাপি তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। সেই বিদেশে তাঁহার মনের মত সুপাত্রও পাওয়া যায় নাই। কন্যাটিকে সেখানকার ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া রীতিমত সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং নিজে মনের মত করিয়া গীতবাদ্য শিখাইয়া-ছিলেন। অভয়াচরণের মৃত্যুর পর বালিকা প্রবাসে অসহায় হইয়া পড়িল। অভয়াচরণের আদেশ-মত তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু তাহাকে রামলোচনের নিকট লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া রামলোচনকে সংবাদ দিলেন। দেশে রটিয়া ছিল, অভয়াচরণ খৃষ্টানের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাই দেশের সকলে অভয়াচরণের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখেন নাই।

অদ্য সেই বালিকার আসিবার কথা। রাম-লোচনের গৃহিণী সুরসুন্দরী বহুদিনাবধি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ, মেজাজ আরো রুক্ষ। তাঁহার এত বহুদিন-বিস্মৃত ভাসুর-তনয়ার আগমন-সংবাদ তেমন সুবিধাজনক বোধ হইতেছিল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা তা তোমার দাদা কি কিছু টাকা-কড়ি রেখে গেছেন ?"

—তা রেখে গেছেন বই কি। তাঁর লাইফ-ইনসিওর ছিল, মেয়ের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডেও টাকা আছে। মাসে ৬০।৭০ টাকা আয়, সেই ভদ্র লোকটি তো তাই লিখেছেন।

—তা বেশ হবে, তাহলে আমাদের কিছু খরচ হবে না। হাঁ গা তা বিয়ে-থাওয়ার কি হবে ?

—দাদা তার ব্যবস্থাও করে গেছেন। নগদ টাকাও তো কিছু আছে।

—কত বড় মেয়ে ?

—তা বয়স ষোল সতেরো হবে।

—সে কি ! লোকে বলবে কি ? তাকে নিয়ে শেষে জাত খোয়াবো নাকি ?

—এ বিদেশে তোমার আবার জাত যাবার ভয় হ'ল কিসে ? সব তাতে অত ভয় পাও কেন ?

হাঁ তাকে কে আনতে গেল ? তার জন্য ঘর ঠিক করেছ ত ?

—সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। যখন সে আমার বাড়ীতে আসছে, আমি সবই ঠিক কোরবো। তোমার ইস্কুলের চাপরাশী অচ্যুতকে পাঠিয়েছি।

—বেশ করেছ, সঙ্গে যে-ভদ্রলোকটি আসছেন, তিনি দাদার বন্ধু। কাল ভোরেই চলে যাবেন।

এমন সময় দূরে গাড়ীর শব্দে রামলোচনবাবু বারান্দায় বাহির হইলেন। গাড়ী সশব্দে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অচ্যুত চাপরাশী গাড়োয়ানকে কহিল,—"ঝট্ কণা সব্ সামান উতারি আন্"। *

তারপর সজোরে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিবার পর, একজন ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিত বয়স্ক ব্যক্তি বাহির হইলেন। তাহার পরে একটি কিশোরী বালিকা আধুনিক সভ্য সজ্জায় সজ্জিত হইয়া জুতা-পায়ে নামিয়া দাঁড়াইল। রামলোচনবাবু বালিকার সজ্জা দেখিয়া যতটা বিস্মিত না হইলেন, তাহার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বালিকা ভয়চকিত-নেত্রে একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিল। সেই-ভদ্র ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া রামলোচনবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মশায় ভাল আছেন ?"

রামলোচনবাবু প্রতি-নমস্কার করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি অন্নদাবাবু ?"

—হাঁ মশায়, আর এই শীলা আপনার দাদার কন্যা।

শীলা অগ্রসর হইয়া সভয়ে তাহার খুল্লতাতকে প্রণাম করিল। খুল্লতাতও বিস্মিত ভাবে বলিলেন. "শীলা কি নাম ?"

অন্নদাবাবু হাসিয়া বলিলেন,"ওর নাম চারুশীলা কিন্তু ওকে ইস্কুলে সবাই 'শীলা' বলে' ডাকতো বলে আমরা সবাই ওকে 'শীলা' বলে ডাকি। ইংরাজী ইস্কুল কি না—শীলা ইংরাজী নাম। তাই তারা চারু বাদ দিয়ে 'শীলা' বলে ডাকতো।

রামলোচনবাবু কটকে থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজের ও খৃষ্টান মিশনারীদের অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন। শীলার সাজ-সজ্জা, তাহাদের ঘরে অদ্ভুত হইলেও নূতন বোধ হইল না। তদ্ভিন্ন তিনি প্রথমে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার দাদা খৃষ্টান হইয়াছিলেন। এখন শীলাকে দেখিয়া তাঁহার সেই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল। তিনি শীলাকে বলিলেন "এস বাড়ীর ভিতরে চল।"

গৃহিণীর সেদিন শরীর আরো বেশী অসুস্থ। একখান তক্তাপোসে মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিলেন। পদশব্দে উঠিয়া বসিলেন ও শীলাকে দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে চাহিয়া রহিলেন। রামলোচনবাবু শীলাকে বলিলেন, "এই তোমার খুড়ীমা, ওঁর শরীর বড় অসুস্থ।" শীলা তাঁহাকে নমস্কার করিতে গেল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"ওই বেশ হয়েছে থাক থাক্ রেলের কাপড়ে এখন ছুঁয়ো না। ওপরের ওই ছোট ঘরটা তোমার জন্যে ঠিক করা আছে। অমিটা গেল কোথায় ? অমি ও অমি—"

একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক "থাই মা" বলিয়া গৃহিণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—যা তোর দিদিকে ওপরে নিয়ে যা, অচ্যুতকে ডেকে দে ; জিনিস-পত্র ওপরে তুলবে।

অমিয় একদৃষ্টে অপলক-নেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিল। সে ধীরে-ধীরে বলিল, "চলুন ওপরে যাবেন।"

শীলা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে তাহার সহিত চলিয়া গেল। গৃহিণী 'অচ্যুত, অচ্যুত' করিয়া ডাকায় সেই চাপরাশী সেতার হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"কঁড় মা কঁড় কহুছন্তি ? গাড়ীঅলা মোকে বাবুর পাকে ঝুটা

* শীঘ্র-সব দ্রব্য নামাইয়া আন।

বনাই দেলা মু তাকে দেখি নেবি। সে কো আড়ে পলাবা পুতাকে মারি পকাবি।" *

গৃহিণী অচ্যুতের সেই মেজাজ দেখিয়া বলিলেন, কিরে কি হয়েছে? অমন করছিস কেন?"

—"মু তার দশ গণ্ডা পয়সা ভড়া ঠিক করি থিলি। সে কর্ত্তাবাবুর পাকে কহিছে কি আট গণ্ডা তাকে দেই মু দুই গণ্ডা জটি নেবি। মু পুতাকে মারি পকাবি।" †

গৃহিণীর মেজাজের ঠিক নাই। তাঁর এ বচসা ভাল লাগিল না। বলিলেন,—"দূর হোকগে তোর কথায় আর কাজ নেই। তোর হাতে ওটা কি?"

—এটা বজা পরে। বাবা এ টুকি যে মেম পরি দিশুছে। মেমর সাজ পরিছন্তি। জোড়ে মেমর জুতা, সে বাবু ভি সাহেব পরি অছন ইঙ্গিরিতে কঁড় গট মট করুথিলে! বড়া সমান মা, কো আড়ে রাখিবি। ‡

—সব উপরের ছোট ঘরে আর ব্যুরান্দায় নিয়ে রাখ। হয়েছে, একি হল? আর যে জাত-ধর্ম্ম কিছুই থাকবে না। শ্রীহরি একি করলে,—যা শীগগির সব নিয়ে যা।"

অচ্যুত এক এক করিয়া সব দ্রব্য উপরে রাখিয়া আসিল। রামলোচনবাবু অতিথিকে বাহিরে বসাইয়া ভিতরে গৃহিণীর নিকট আসিলেন।

গৃহিণী তখনো বিস্মিতভাবে বসিয়া আছেন। রামলোচনবাবুকে দেখিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তাহলে এ সত্যই খৃষ্টান, জাত নেই। আমাদের কি হবে?"

—অত এখন ভাবলে চলবে না। যখন দাদা তার মেয়েকে আমার কাছে পাঠাতে বলে গেছেন, আমার হাতে ভার দিয়েছেন, তখন আমি ফেলতে পারবো না।

গৃহিণী যদিও ক্রোধে উত্তেজিত, কিন্তু স্বর উচ্চে তুলিবার জো নাই। একে গৃহে অতিথি, তার উপর ওই মেয়েটাকে দেখিয়াও একটু থতমত খাইয়া আছেন। তিনি ক্রোধে কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"এত উপকার না করলে কি হত না? কেন ওর মামার বাড়ীর কি কেউ নেই?"

—কেউ থাকলে কি সেই লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে আসে? আর এককথা;—এই নাও অন্নদাবাবু আমায় দিলেন, দাদা আমায় দু'হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়ে গেছেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া উঠিয়া বসিয়া কাগজ দুখানা হস্তে করিয়া বলিলেন, "সত্যি? তবে তো তোমার দাদা খুব ভাল। মেয়ের জন্য কত টাকা আছে?"

—মেয়ের বিয়ের দশ জন্ম হাজার টাকা রেখে গেছেন। সেই টাকার সুদ ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ৩০৲ টাকা সবই ওর হাতে মাসে-মাসে আসবে। সে-সব ওর কাছেই আছে। অন্নদাবাবু বলছিলেন, আমরা যদি শীলাকে না রাখি, তাহলে ও কোনো মিশনারী মেমের কাছে থাকবে। কিন্তু যে ওকে রাখবে সে-ই এই দুই হাজার টাকা পাবে।

গৃহিণী তখনো মুঠার মধ্যে সেই কাগজ দুখানি ধরিয়া ছিলেন। তিনি চকিত হইয়া বলিলেন, "বাপরে তাকি হয়—দু হাজার টাকা সে কি কম কথা? আর এতো আমাদের দেশ নয়। তোমার ইস্কুলের কত মাষ্টার তো ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান। আমি

---

* মা কি বলছেন? গাড়ীওয়ালা বাবুর কাছে আমায় মিথ্যাবাদী বলিল;—তাহাকে দেখিয়া লইব সে কোথায় যাইবে। বেটাকে মারিয়া ফেলিব।

† আমি দশআনা ভাড়া করেছিলাম, সে কর্ত্তাবাবুর কাছে বলিল যে তাকে আটআনা দিয়া আমি ঠকিয়ে নিলাম। তাকে দেখে নেব।

‡ এটা বাজনা। বাবা এ মেয়ে মেমের মত। মেমের পোষাক পরা পায়ে মেমের জুতা। সঙ্গের বাবুও সাহেবের মত ইংরাজীতে কট মট করিতেছিল। বড় জিনিস মা, এত সব কোথায় রাখিব?

ওকে কিছু ছুঁতে দেবো না, ওর ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাব না। থাক ও যেমন এসেছে একপাশেই থাক।"

—যেমন সুন্দরী মেয়ে, তার উপর দশ হাজার টাকা, ও কি পড়তে পাবে। শীঘ্রই ওর বিয়ে হয়ে যাবে। ভাবনা নেই গিন্নী। কিন্তু তুমি একটু সামলে চোলো। মুখটা মিষ্টি রেখো। ইংরাজী জানা মেয়েরা একরোখা হয়, চট করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে আর দুটি হাজার টাকা ফসকে যাবে।

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি গো সব জানি। আমায় আর শেখাতে হবে না।"

২

শীলা ধীরে ধীরে অমিয়র সহিত দ্বিতলের গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বিতলে দুটি মাঝারি ঘর ; একটি বারান্দা ও ছোট ঘর। সেই বারান্দার কোণে ছোট ঘরটি শীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; কারণ সেই ঘরটি উপরের একপার্শ্বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যাদি না আসিল শীলা ততক্ষণ সেইস্থানে একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অমিয় ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "আপনি বসুন।" শীলা তাহার প্রতি চাহিল বালকের মুখ সরলতায় পূর্ণ। তাহার সেই সুকুমার মুখের প্রতি চাহিলে মনে আপনা হইতে স্নেহের উদ্রেক হয়। শীলা তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমায় আপনি বলছ কেন ভাই ?"

—তবে কি বলব ?

—আমি যে তোমার দিদি হই।

অমিয় হর্ষোৎফুল্ল-আননে বলিল, "তবে আমি তোমায় দিদিভাই বলব কেমন ?" শীলা তাহার মধুর কথায় হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই বোলো। এখন তুমি যাও, আমি শীগগির রেলের কাপড় ছেড়ে ফেলি, না হলে খুড়ীমা বিরক্ত হবেন।"

—আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। আবার কিন্তু আসবো দিদিভাই কেমন ?

সে চলিয়া গেল। শীলা ধীরে ধীরে তাহার একটি সিন্দুকের উপর বসিয়া পড়িল। সুদীর্ঘ পথ ট্রেনে আসিয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে ও অপরিচিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিল। সে বাল্যকাল হইতে যে-ভাবে লালিত হইয়াছে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তাহার পিতার সে বড় আদরের কন্যা ছিল। তাহার পিতা কখনো তাহাকে সঙ্গ-ছাড়া করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে বলিয়াছিলেন, "কটকে তোমার কাকার কাছে গিয়ে থেকো, হাজার হোক এ বিদেশ।" শীলা পিতার সেই শেষ-আদেশ মানিয়া আজ এখানে আসিয়াছে। তাহার খুড়ীমার মুখ মনে করিয়া হৃদয় কম্পিত হইল। কি করিয়া থাকিবে ! সেতো হিঁদুয়ানীর কিছুই জানে না। তাহার ইস্কুলের বন্ধু 'এমেলি' 'মেরি' 'লুইসি'। সে এইপ্রকার বন্দীর দশায় কি থাকিতে পারিবে ? তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। সে ভাবিল, কেন সে সেখানকার কন্‌ভেণ্টে রহিল না ! একাকী কি কেহ থাকে না ? পিতার আদেশ মনে করিয়া সে তাহার অসংযত হৃদয়কে সংযত করিল। অশ্রু মুছিয়া শীঘ্র সে আপনার বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে আপনার দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিল। সেতারটিকে, বক্স-হারমোনিয়মটিকে সযত্নে এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল। আর কি কখনো সে এ-সব ব্যবহার করিবে ? তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কোথায় সে লক্ষ্ণৌ আর কোথায় এই কটক ? কি আশ্চর্য্য ঘটনা। সে কি একমাস পূর্ব্বে কল্পনায় ইহা ভাবিতে

পারিয়াছিল ? এমন সময় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। রামলোচনবাবু তাহাকে ডাকিলেন। সে চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। গৃহিণী তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। দূরে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে ও আহার প্রস্তুত।

গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এসো খাও, পথে ক'দিন খুবই কষ্ট গেছে।"

শীলা অপ্রস্তুতভাবে বলিল,—"না কষ্ট কিছু নয়। আমায় এখনি কেন খেতে ডাকলেন, আপনারা তো কেউ খান নি।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "সে কি হয় ? আমার তো অম্বলের অসুখ, রাত্রে কোনো দিন খাই, কোনো দিন খাই নে। একটু খই-দুধই বরাদ্দ। অমিটা বিকেলেই খায়। ওকে ইস্কুলে দিয়েছিলুম, সে ক'বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগে এখন পড়া বন্ধ রেখেছি। ওঁর তো পড়ানোর সময় নেই, মাষ্টার রাখবারও সঙ্গতি নেই, ছেলেটা কেবল খেলেই বেড়ায়।"

—আমি ওকে কাল থেকে পড়াব।

—সত্যি নাকি ? ও যে অনেক ইংরিজী পড়ে, আর কি কি ছাই পড়ে মনেও করতে পারি নি, তুমি কি সব পার্বে ?

—হাঁ আমি ওকে পড়াতে পারবো। আমার বাবা আমায় বলে গেছেন, যদি আমার ইচ্ছে হয়, আমি কোনো ইস্কুলে কাজ নিতে পারি। একজন্য তিনি আমায় বেশ ভাল করেই সব শিখিয়েছেন।

—তা বেশ তো তুমিই ওকে পড়িয়ো। ছেলেটা কেবল রোদে-রোদে ঘুরে বেড়ায় বইত নয়। তা খেতে বোসো, আর দেরি কোরো না। তোমার হলে তারপর বাবুরা খাবেন।

শীলা বসিয়া পড়িল। আহারাদির পর সে বারান্দায় একপাশে টুলে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু ও রামলোচনবাবু আসিয়া আহার করিতে বসিলেন।

অন্নদাবাবু বলিলেন, "আমি তো কাল দুপুরের গাড়ীতেই যাব মা, তোমার যা দরকার হবে বোলো। আর তোমার মার কি-রকম আত্মীয় এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবেই, আমি লিখে দেবো। তাঁরা এখানেই অনেক দিন থেকে আছেন। তাঁদের মস্ত জমিদারী। তোমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হলে ভালই হবে। আমি পারি তো কাল দেখা করে যাব।"

—মার তো কেউ আত্মীয় ছিলেন বলে মনে নেই, তাঁরা কি করেন ? তাঁর নাম কি ?

—প্রভাতবাবু এখানকার একজন মস্ত জমিদার। তাঁরা তুলসীপুরে থাকেন। আমি দেখি যদি পারি তোমার কথা বলে যাব।

রামলোচনবাবু এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। প্রভাতচন্দ্র বসু, কটকের একজন বিখ্যাত জমিদার। তাঁর পিতা নাবালক পুত্র রাখিয়া বহুদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রভাতবাবুর মা তারাসুন্দরী দেবী তাঁহার জমিদারীর কার্য্য নিজেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের খুব নাম-ডাক। দেশের সকল সাহেব মেম তাঁহাদের বাটীতে যাওয়া-আসা করে। অল্পদিন হইল প্রভাতবাবুর বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার ছোট ভাই সুব্রত সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে এবং সেখানেই প্রাক্‌টিস্ করিতেছে।

রামলোচনবাবু বলিলেন, "প্রভাতবাবুর মার সঙ্গে কি দাদার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল ?"

—কি সম্পর্ক ঠিক জানি নে, খুবই দূরের হবে অথবা আত্মীয় হবে। তবে প্রভাতবাবুর মার সঙ্গে তাঁদের খুব পরিচয় ছিল। যখন শীলা ছোট ছিল, প্রভাতবাবুর মা তখন ছেলেদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যান, সেখানেই পুনরায় সব আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। অজয়বাবু আমাকে বলেছিলেন, "কটকে আমার ভাই আছেন, তারাদিদিরা আছেন, আমার মেয়ের কোনো কষ্ট হবে

না। তাঁরাও মাঝে মাঝে শীলাকে নিয়ে যাবেন।' আর আপনি তো বুঝছেন যে শীলার যাওয়াও দরকার।

শীলা তাহার খুড়ীমার নিকট উঠিয়া গেল।

অন্নদাবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভাতবাবুর সহিত শীলাদের কোনো সম্পর্ক নেই; শীলার মার সঙ্গে প্রভাতবাবুর মাসীমার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সম্পর্কে প্রভাতবাবুর মাকে দিদি বলেন। প্রভাতবাবুর ভাই সুব্রতর সঙ্গে শীলার বিয়ের কথা প্রভাতবাবুর মা বলেছিলেন, তাই কটকে মেয়ে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন। আপনি দেখবেন যেন মেয়েটির অমতে বিবাহ না হয়। শীলার ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে; সে এখন সাবালিকা। শীলার পিতার ইচ্ছা ছিল, শীলা ভাল পাত্রে সমর্পিত হয়; এখানে এসে চেষ্টা করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে তা ঘটল না। একটিমাত্র কন্যা বলে তিনি কোনোমতে তার বিবাহ শীঘ্র দিবার কথা মনেও আনেন নি। আপনিও তার অমতে তার বিবাহ দেবেন না। সে যদি মত না করে তবে সে যে-কোনো উপায়ে নিজের দিন কাটাবে। শীলা বড় বুদ্ধিমতী, সে আপনাদের কোনো কষ্ট দেবে না। তবে সুব্রতর সহিত বিবাহ হলেই শীলার পক্ষে ভাল হবে।"

রামলোচনবাবু এইসব কথাবার্তা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। শীলার সেই সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার জাতি না থাকিলেও বোধ হয় তিনি তাহাকে স্নেহ করিতে পারিবেন মনে হইতেছিল। তিনি গৃহিণীর নিকট সকল কথা বলিলেন। গৃহিণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জমিদার-পুত্র জামাই হইলে মন্দ কি? তাঁর তো আর মেয়ের বিবাহ দিতে নাই যে জাত যাবে। জাত বাঁচিয়ে চললেই হবে।

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া আপনার শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময় ধীরে ধীরে কক্ষদ্বারে আঘাত হইল; সে দ্বার খুলিয়া দিল, দেখিল অমিয়। সে চমকিত-ভাবে বলিল, "তুমি এখনো শোও নি!"

—দিদিভাই, আমি যে বলেছিলুম আবার আসবো, তাই এসেছি।

—তুমি কোন্ ঘরে শোও?

—এই পাশের ঘরে আমি একলা শুই।

—কেন?

—তা তো জানি নে, মা আমায় বলেছেন এই ঘরে শুতে; মাঝের দরজা খুলে রাখেন, আজ আমি ভেজিয়ে চলে এসেছি। এস দিদিভাই, তোমায় একটা জিনিস দেখাই।

এই বলিয়া বালক শীলার হাত ধরিয়া লইয়া সেই ঘরের জানালা উন্মুক্ত করিল। শীলা দেখিল সম্মুখে নদী, আর নদীর ধারেই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা চন্দ্রালোকে উন্নত হইয়া রহিয়াছে।

—এ কাদের বাড়ী?

—ও-বাড়ী জমিদার শরৎ রায়ের। বাড়ীতে কেউ নেই, শুধু দুজন মালী আছে। আমি রোজ লুকিয়ে-লুকিয়ে ঐ বাগানে যাই, কাল তোমায় নিয়ে যাব। বাগানে কত ফলের গাছ। কেউ কোথাও নেই, বাড়ী খালি পড়ে আছে।

—খালি পড়ে আছে কেন? ও-বাড়ীতে কি কেউ নেই? জমিদারবাবু কোথায়?

—তিনি অনেক বছর হল বিলেত গেছেন। কেউ বলে দেশে ফিরেছেন, তিনি মস্ত জমিদার, তাঁর ঢের বাড়ী, অনেক-দেশে বাড়ী আছে। তিনি এখানে থাকেন না। বাড়ী চাবি-বন্ধ, বাবার কাছে তাঁর চাবি আছে। বাবা তার মোক্তার কি না।

—মোক্তার কি?

"মোক্তারের মানে জান না" বলিয়া অমিয় হাসিয়া উঠিল।

—আচ্ছা তুমি এখন শোও গে,তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

সস্নেহে তাহার ললাটে হস্তস্পর্শ করায় বালক প্রীত হইয়া চলিয়া গেল।

শীলা বহুক্ষণ সেই ইন্দ্রপুরী-তুল্য শূন্য প্রাসাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! কল্পনায় দেখিল, সেই শূন্য প্রাসাদ লোকসমারোহে পূর্ণ, চারিদিক আলোকমালায় উজ্জ্বল, কক্ষে-কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কত লোক তাহাতে হাস্যমুখে বিচরণ করিতেছে! এমন সময় দূরে সেই প্রাসাদের নিকট হইতে অতি মধুর কণ্ঠে গীত শ্রুত হইল।

আমি জনম জনম কাহারে খুঁজিয়া
ফিরিনু কাহার আশে,
সে-কথা স্মরিয়া আমারে চাহিয়া
তাই বুঝি চাঁদ হাসে।
তাই লহরে লহরে তটিনী বহিয়া
কহে কত কল-কলে;
তাই সরমে আকুলি পড়িছে ঝরিয়া
ফুলদল তরুতলে।
ওগো পরাণ-রতন, কোন্ সিন্ধুতলে
করিছ কোথায় বাস,
এসো নিমেষের তরে সমুখে আমার
মিটাও সকল আশ।

শীলা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই গীতধ্বনি শুনিল। এ গীত সে বহুবার শুনিয়াছে, এমন মধুর কখনো বোধ হয় নাই! সে ধীরে ধীরে গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। (ক্রমশ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধ তথ্য

১। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব ইস্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী আবদুল করিম সাহেব মুসলমান-সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২। কুচবিহারের মহারাজা ও মহারাণী শিকারে গিয়াছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে দুইটা বাঘ শিকার করিয়াছেন। রাণী-শিকারী এই দ্বিতীয়।

৩। বোম্বাই আমেদাবাদের বিখ্যাত ধনকুবের স্যার চুনীভাই মধোলালের দেহান্তর ঘটিয়াছে। এদেশের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র "ব্যারনেট" ছিলেন। স্যার চুনীভাইএর পিতামহ ৫২ বৎসর পূর্ব্বে আমেদাবাদে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য একটি পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজন্য তিনি মাসিক ২২০৲ টাকা বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছাত্র ইহার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন।

৫। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন—"সমগ্র দেশের স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ঠিক একপ্রকার ব্যবস্থা ও সকলের শিক্ষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে, এমন হইতেই পারে না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ ও জীবন-যাত্রার

অনুকূল করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোথাও সামান্য লিখন, পঠন ও হিসাব পর্য্যন্তই শিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইবে; আবার কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদিগের কন্যার পারিবারিক কাজ-কর্ম্মের শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট; কেহবা বলেন, তাঁহাদের বালিকাদের ধর্ম্ম ও প্রাচ্য বিদ্যার শেষ শিক্ষা পাওয়া দরকার। আবার অন্য একদল বলিতেছেন, তাঁহাদের বালিকাদের যথারীতি ইংরাজী বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখাইয়া দিতে হইবে। এইসকল দাবীরই বিচার করিতে হইবে। যথাসম্ভব সকলের প্রয়োজন মিটাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা তিরোহিত হইতেছে, সংসারে প্রবীণা মহিলার অভাবপ্রযুক্ত নবীনাদের সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্মে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এজন্য এসকল বিষয়ও তাঁহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৬। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বামাবোধিনীর সর্ব্ব প্রথম পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় বহুদিন শয্যাগত থাকিয়া সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি চিরদিন বামাবোধিনীর হিতৈষী থাকিয়া ইহার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন।

বর্ষগীতি

বরষের পর যেতেছে বরষ আপন চিহ্ন আঁকি',
সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।
কোথা হ'তে আসে তরুণ আশার লক্ষ উদার ঢেউ,
দেখিতে দেখিতে কোথা মিশে যায় ভাবিয়া না
পাই কেউ!
কবে ফুটে উঠে রক্ত তপন উজ্জ্বল করি' ধরা—
পাখীকুল গায় কুসুম বিকাশে বহে বায়ু প্রাণহরা!
মনে অনুমানি বুঝি এ ধরণী কেবলি জোছনা-মাখা,
বসন্ত হেথা রহে চিরদিন শান্তির কোলে ঢাকা!
আবার কখন সকলি মিলায় নিমেষ না হ'তে শেষ,
সারাটি বক্ষ কেঁপে উঠে দুখে হা বিধি, হা পরমেশ!
নিমেষে নিমেষে ফুরাইয়া আসে সম্বল যা' ছিল কিছু,
আমরা সবাই বৃথা ছুটে যাই আলেয়ার পিছু-পিছু!
নিবিড় সাধনে আকুল রোদনে বরষ বাধা না মানে,
আপনার মনে বেগে চলে যায় অজানিত পথ-পানে!
দু'ফোটা অশ্রু নাহি ঝরে কভু ভুলা'তে ব্যথিত-ব্যথা,
নাহি ফোটে হাসি অধর-প্রান্তে শুনি' কারো সুখ-কথা।
জগতের সব হরিষ-বিষাদে স্থির অচঞ্চল রহি'—
আর্য্য ঋষির মতন কেবল বরষ যেতেছে বহি'!
বিশ্ব তোমার তপোবন কি গো, হে সৌম্য হে মহান্,
কার আশা চেয়ে অনন্ত-হৃদয়ে করিতেছ এ ধেয়ান?
কেবা সে বিরাট দেবতা তোমার, কেবা সে পূজ্য
তব?
সমুদ্র-যাত্রী পথিক আমরা, তাঁরে কি দেখিতে পাব?
যা-কিছু মোদের দিয়েছ আদরে যা-কিছু নিয়েছ হরি,
হে বরষ, আজি শেষ মুহূর্ত্তে সাশ্রুনয়নে স্মরি!
বুঝিতেছি এবে কিছুই মোদের অমনি ব্যর্থ কভু,
সকলি তোমার মঙ্গল-ক্রোড়ে পাইয়াছে ঠাঁই প্রভু!
নিঠুরের মতো কেমনে তোমায় দিব গো বিদায়
আজ! নিখিল তেয়াগি এসো হে রাজন্, আমাদেরি
হৃদি-মাঝে! হেথা হবে তব পুত রাজধানী—হেথা
হবে তব ঘর, সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা, সখা তব,
নহি 'পর'!

শ্রীননীবালা দেবী।